PROGRESSIVE JEWS SUPPOR
PALESTINIAN PEOPLE'S
JUST STRUGGLE

পালেস্তাইনের গল্প, কবিতা প্রবন্ধ

רות
דות והאדה, הינו
עם בהבעת התמי
העם הפלשתינ

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ —

প্রদীপ মুখার্জী

২৩/৫/৮৩

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনের গল্প, কবিতা প্রবন্ধ

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ

সম্পাদনা

ধরিত্রী রায়

সুলতান আহমেদ

২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০০০৯

দীপায়ন

Scanned with ACE Scanner

Palestine-er Galpa Kavita Prabandha

An anthology of Palestinian stories, Poems & essays

Edited by

Sultan Ahmed

Dharitree Roy

প্রকাশকাল

ভাদ্র ১৩৯০

[] রেনুকা সাহা ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৯ : প্রকাশক

[] অসীম সাহা দি প্যারট প্রেস ৭৬/২ বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০০০৬ : মুদ্রক

[] প্রবীর সেন পি ১৩৪ সি আই টি রোড কলিকাতা-৭০০০১০ : প্রচ্ছদপট

[] স্পেকট্রাম ১৭ মনীন্দ্র মিত্র রো কলিকাতা-৭০০০০৯ : প্রচ্ছদমুদ্রক

বারো টাকা

Scanned with ACE Scanner

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে
বিশ্বশান্তির পক্ষে
সংগ্রামরত কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের উদ্দেশে

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইন সাহিত্য প্রধানত আরব মূল সাহিত্যধারার একটি অংশ মাত্র। পালেস্তাইনের সাহিত্যিক কবি শিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে আরব দুনিয়ার বিভিন্ন শহরের সাহিত্য সংস্কৃতি চক্রগুলিকে কেন্দ্র করে আরব শিল্প ও সাহিত্যের মূলধারাকে সঞ্জীবিত করেছেন, করেছেন পরিপুষ্ট। জিয়োনিস্ট দখলদারির পরে পালেস্তাইনের রক্তক্ষরা দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি সংগ্রাম পালেস্তেনীয় সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। সমগ্র পালেস্তেনীয় সাহিত্যই ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে প্রতিরোধের সাহিত্যে। এই প্রতিরোধ শুধু মাতৃভূমির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নয়, এই প্রতিরোধ পালেস্তেনীয় ঐতিহ্য, শিল্পসংস্কৃতি তথা সমগ্র পালেস্তেনীয় জাতিসত্বার রক্ষার সংগ্রামে আজ পর্যবেসিত হয়েছে।

এই কবিতাটির নাম 'শুধু তোমরাই পারো', পালেস্তাইনে কর্মরত জনৈক ডেনিস নার্সের লেখা। এই আশ্চর্য কবিতাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে পালেস্তাইন সংগ্রামের আদর্শ আশা রক্ত ঘাম ধ্বংশ আকাঙ্খা এবং সৃষ্টি।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়
জিজ্ঞেস করি
কেমন করে তোমাদের গালে
হাসলে পরে আজো টোল পড়ে
যখন জানি এতটা কাল কেটেছে কান্নায়।
ভোরের আলোর মত হাসি
কেমন করে হাস
যখন জানি বুকের গভীরে
রয়েছে জমা শতাব্দীর অন্ধকার ক্রোধ
কেমন করে তোমাদের মুখ
এত মসৃণ
যখন জানি আঘাতে আঘাতে ও মুখ
থেত্‌লে দেয়া হয়েছে বারবার
কেমন করে ও দুটো কবজিতে
এত শক্তি ধরো
যখন জানি দুটি বুলেট এখনও বিদ্ধ ও হাতে।
কেমন করে শরতের প্রথম বৃষ্টির মত
মোলায়েম তোমাদের কণ্ঠস্বর
যখন জানি তোমাদের কানে
প্রতিদিন বাজে

Scanned with ACE Scanner

কামানের গর্জন
যা নিত্য মারে মানুষ
কাজে অকাজে ॥
কেমন করে রসিকতা শুনে
আজো তোমাদের চোখে
খেলে যায় হাসির ঝিলিক
যখন জানি কত প্রিয়জনের দুচোখ
বুজিয়ে দিয়েছ নিজের হাতে।
আমি বিস্মিত হই ॥
পাশের ঘরের শিশুটির কান্নায়
আজো তোমরা উতলা হও
অথচ এ দুর্ভাগা ক্যাম্প পরিপূর্ণ
নিষ্পাপ শিশুদের কান্নার রোলে
যেমন পরিপূর্ণ ফ্যাসিস্ট কারাগার
তোমাদের কমরেডদের নিঃশব্দ অশ্রুজলে।
তবে আমি কোনো উত্তর চাই না
কারণ উত্তরটা আমার জানা ॥
আমি শুধু চাই
আমাকে দাও কিছু তোমাদের সেই
অফুরান ভালবাসা
নিপীড়িত মানুষের জন্য যা তোমরা
করে থাক ধারণ
দাও কিছু
তোমাদের সেই শক্তি
যা দিয়ে তোমরা লড়ে যাও
লড়ে যাও
আমি জানি আমি চাইছি অনেক
তবে এটাও জানি
কেউ যদি তা দিতে পারে
তাহলে তা শুধু তোমরাই পারো
তোমরাই পারো ॥

Scanned with ACE Scanner

সংকলন প্রসঙ্গে

এই ক্ষুদ্র সংকলনে প্যালেস্তাইনের কিছু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও কয়েকটি ছবির মাধ্যমে সমগ্র প্যালেস্তেনীয় শিল্প সাহিত্যের একটি আভাস দেবার চেষ্টা আমরা করেছি। পরবর্তী সময়ে সম্ভব হলে প্রত্যেকটি দিক নিয়ে আলাদা সংকলন করবার ইচ্ছা রইলো। এই সংকলনে বিভিন্ন দিকে নানা কারণে বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেল আশা করছি, পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধিত করতে পারব। একটি নাটক দেবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও সম্ভব হয়ে উঠল না।

গল্প কবিতা প্রবন্ধ সবই নানা পত্রপত্রিকা এবং ব্যক্তি বিশেষের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অনেক কবি এবং গল্পকাররা সাগ্রহে তাদের অনূদিত কবিতা গল্প এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে দিয়ে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পত্রিকা সম্পাদকদের কাছ থেকে অনুমতি নিলেও হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদক কবি এবং গল্পকারদের অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয় নি, আশাকরি তারা ক্ষুন্ন হবেন না।

এই সংকলন করবার পেছনে সর্বসময় উৎসাহ এবং তাগিদ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক গোলাম কুদ্দুস, তাঁর সহযোগিতা ছাড়া এই সংকলন প্রকাশ করা কখনোই সম্ভব হতো না। এই সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সম্পাদকদের সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা যথা দৈনিক কালান্তর, যুবমানস, লেখক সমাবেশ, ভারত ও জি ডি আর পত্রিকা, নান্দীমুখ ইত্যাদি। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য, শ্রীসুবোধ রায়, এবং শ্রীমতি কেয়া সাহাকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য।

সম্পাদকদ্বয়

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইন কবিতা

ইয়াকভ এভিদের উদ্দেশে	৩	ফাওয়াজ তুর্কি
চিরদিনের পালেস্তাইন	৫	ফাদোয়া তুকান
পরবাসী	৬	সালেম জুবরান
আমি তোমাদের হাঁক দিয়ে ডাকি	৭	তোয়াফিক জায়াদ
পরিচয় পত্র	৯	মাহমুদ দারবিশ
শান্তির নদী ও যুদ্ধের কামান		
জাতিপুঞ্জের কাছে পালেস্তাইন	১১	আজতোয়াই জ্বারা
রাতের জেরুজালেমবাসী	১৪	ইজাম হাম্মদ
রাফার শিশুরা ঃ ১	১৬	শামী-আল্-কাসিম
বিচ্ছেদের পর	১৮	আবু সালমা
ঈশ্বরের কাছে পালেস্তাইন শিশুদের		
চোখের জলে ভেজা কিছু প্রশ্ন	১৯	
ওদের আগ্রাসনকে আমরা ঘৃণা করি	২২	জনৈক মহিলা কবি
ক্রোধ	২৪	মাহমুদ দারবিশ
গাছ	২৫	ফাদোয়া তুকান
আশা	২৬	মাহমুদ দারবিশ
মৃত্যুকে পেছনে ফেলে জেগে ওঠো	২৭	তোয়াফিক জায়াদ
বেপরোয়া	২৮	মাহমুদ দারবিশ
ফাঁসি লটকানো আরব	২৯	সালেম জুবরান
রাফার শিশুরা ঃ ২	৩০	শামী-আল-কাসিম
একজন মানুষকে	৩২	মাহমুদ দারবিশ
জয় পরাজয়	৩৩	তোয়াফিক জায়াদ
পালেস্তাইনের একজন প্রেমিক	৩৪	মাহমুদ দারবিশ
প্লাবন ও বৃক্ষ	৪০	ফাদোয়া তুকান
উত্তাল জোয়ার	৪২	অজ্ঞাত
প্রত্যাশা	৪৩	মাহমুদ দারবিশ

Scanned with ACE Scanner

যুদ্ধজয়ের মহফিলে	৪৪	অজ্ঞাত
অসম্ভব	৪৬	তোয়াফিক জায়াদ
একজন নির্বাসিতের চিঠি	৪৯	মাহমুদ দারবিশ
রাষ্ট্রপুঞ্জের চতুর সুবেশ		
বাবুমশাইদের প্রতি	৫২	সামী-এল-গাশেম
অল-আসিফার শপথ	৫৪	মাহমুদ দারবিশ
প্রতিক্রিয়া	৫৫	মাহমুদ দারবিশ
রুমাল	৫৭	মাহমুদ দারবিশ
একজন সৈনিক		
যে সাদা পদ্মর স্বপ্ন দেখে	৫৯	মাহমুদ দারবিশ

পালেস্তাইন গল্প

তিরিশ লাখের একজন	৩	গাজি ডানিয়েল
পর্বত	১০	ওয়ালিদ রাবহ্
সহিষ্ণু দেশ সহিষ্ণু মানুষ	১৫	সুভি হামদান
আর এক বিদ্রোহী	১৯	হাকাম বালাউই
বন্দুক	১২	নওয়াফ আবু আলহাগা

পালেস্তাইন প্রবন্ধ

পালেস্তাইন প্রতিরোধ সাহিত্যের উত্থান	৩	ঘাস্‌সান কানাফানি
পালেস্তাইনের বিপ্লবী শিল্পকলা	২০	মোনা সৌদি

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ
পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইন কবিতা

Scanned with ACE Scanner

ইয়াকভ এভিদের উদ্দেশে
ফাওয়াজ তুকি

ইয়াকভ এভিদ একজন ইজরেলি
গ্রীষ্মকালে ইয়াকভ সব সময় বসে থাকত
মাউন্ট কারমল পার্কে একটা পাথরের ওপর একা একা।
ইয়াকভ এভিদ ভালবাসত জাহাজঘাটায়
নৌকোগুলোকে দেখতে
আর দিগন্তে সূর্যাস্তের নানারঙের খেলার
দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে।

ওর সঙ্গে দেখা হলেই
আমি বলতুম : সেলাম ইয়াকভ।
ইয়াকভও সব সময় দুহাত তুলে বলত,
সালোম শান্সের।

ইয়াকভ এভিদ ছিল আমারই মত এক যুবক
আমাদের ছুরিকাহত সব নষ্ট স্বপ্নের কথা সে জানে
জানে সব মৃতদের কথা
যারা এখন বেহেস্তে তাদের অভীষ্ট দেবতাদের সান্নিধ্যে।

ইয়াকভ ও আমি
একসঙ্গে বসে এ বিষয়ে কথা বলতুম
তাকিয়ে থাকতুম জাহাজঘাটার দিকে
কখনো বা ইয়াকভ এভিদ বন্দরে
দেখতো, আমাকে নিমজ্জিত স্বপ্নের প্রতিমাগুলোকে
টেনে তোলবার চেষ্টায় নিরত

Scanned with ACE Scanner

ইয়াকভ আমাকে বলত : সালোম শায়ের
আমি বলতুম : সেলাম ইয়াকভ।

ইয়াকভও আমার মতো
সেই নিঃসঙ্গ যাত্রীদের কথা জানে,
যারা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না
যাদের জাহাজডুবি হয়ে গেছে সমুদ্রে।

এখনও আমি জানিনা ইয়াকভ এভিদ কোথায়
কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে তাও জানি.না
আমি ঐ নামে কাউকেই আমি জানতুম না
কিন্তু আমার এই কবিতা তারই উদ্দেশে লেখা।

কৃষ্ণ ধর

Scanned with ACE Scanner

চিরদিনের প্যালেস্তাইন
ফাদোয়া তুকান

মহান
মহান দেশ,
ঘুরে যেতে পারে
ঘুরে যেতে পারে জাঁতার পাথর
ব্যথার ঝাপসা রাতে;
কিন্তু তুচ্ছ ওরা
কিছুতে পারে না ওরা
মুছে নিয়ে যেতে তোমার ভাস্বরতা।

কেননা তোমার ধুলালুণ্ঠিত আশার মধ্য থেকে
ক্রুশকাঠে বেড়ে ওঠার মধ্য থেকে
চুরি করে নেওয়া হাসির মধ্য থেকে,
শিশুদের হাসি থেকে,
ধ্বংসরাশি থেকে,
অত্যাচারের থেকে,
রক্তের দাগে লাঞ্ছিত যত দেয়ালের সারি থেকে,
জীবন ও মৃত্যুর
সব শিহরণ থেকে,
উদ্‌গত হবে জীবন।

হে মহান্‌ ভূমি,
হে গভীর ক্ষত
একমেব ভালোবাসা।

শঙ্খ ঘোষ

Scanned with ACE Scanner

পরবাসী

সালেম জুবরান

সীমান্ত ডিঙিয়ে সূর্য হাঁটে,
বন্দুক নিস্তব্ধ আজ,
একটি স্কাইলার্ক তার সকালের গান শুরু করে
তুলকারামের কাছাকাছি,
উড়ে যায় তারপর প্রাতরাশ খুঁজে,
সাথী তার আরো কতো পাখি ॥
একটি একাকী গাধা বন্দুকের গুলি ভেদ করে
হেঁটে চলে রণক্ষেত্রে
শ্যেনচক্ষু পাহারার নজর এড়িয়ে।

আর আমি, হে স্বদেশ, বহিস্কৃত সন্তান তোমার,
আমার দু চোখ আর তোমার আকাশ ঢেকে দেয়
সীমান্ত-প্রাচীর
কালো পর্দা যেন চোখের উপরে।

মনীন্দ্র রায়

Scanned with ACE Scanner

আমি তোমাদের হাঁক দিয়ে ডাকি

তোয়াফিক জায়াদ

আমি তোমাদের হাঁক দিয়ে ডাকি
আমি তোমাদের করি করমর্দন
আমি তোমাদের পায়ের নীচের মাটি চুম্বন করি,
সাথীরা আমার!

তোমাদের জন্যে আমি মরবো,
বাঁচবো আমি তোমাদেরই জন্যে
তোমাদের কাছে আছে আমার হৃদয়মন, সব।
তোমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমার বড় নিষ্ঠুর আর
আগুনের ছেঁকালাগার মতো,
তোমাদের ব্যথার আমি যেন এক জীয়ন্ত শরিক
আমি আছি তোমাদেরই পাশে, চিরকাল,
সাথীরা আমার
শুন্‌ছো কি, কথা আমার।

আমি তোমাদের হাঁক দিয়ে ডাকি,
আমি তোমাদের করি করমর্দন!
আমার দেশের জন্যে আমি লড়েছি
আমি লড়েছি নির্ভয়ে!
ছিন্ন পোষাক নগ্ন পদে প্রচণ্ড সাহসে দাঁড়িয়েছি
শত্রুর মুখোমুখি।
গায়ে আমার আঘাতের ক্ষতচিহ্ন তবু,
আমি যে নিশান ধরেছিলাম
তা আরো উর্দ্ধে—আমার শহীদ সাথীদের সমাধির 'পরে

Scanned with ACE Scanner

তুলে ধরেছি,
গর্বভরে ভাবি আমি তার কথা,
সাথীরা আমার……

আমি তোমাদের হাঁক দিয়ে ডাকি,
আমি তোমাদের করি করমর্দন ॥

মানব মিত্র

Scanned with ACE Scanner

পরিচয় পত্র

মাহমুদ দারবিশ

আমার নাম লিখে নাও,
আমি একজন আরব
কার্ড নং ঃ পঞ্চাশ হাজার
কাচ্চাবাচ্চা ঃ আটটি
নবমটি জন্ম নেবে আসছে বারের গ্রীষ্মে,
মাথা ঘুরছে ?

আমার নাম লিখে নাও,
আমি একজন আরব
পেশা ঃ পাথরভাঙা, সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে,
রুটি বানানো, জামাকাপড় আর বই
ছেলেপুলেদের জন্যে, জেনে রাখ
কোনদিনই দাঁড়াবো না তোমাদের দরজায় ভিখিরীর মতো
আমি একজন আরব,
চটে উঠছ ?

আমার নাম নেই,
ধৈর্য ধরি তবু, যেখানে সবাই রাগে ফুঁসছে,
আমার মূল গ্রথিত করেছি এখানেই
এই জলপাই আর দেবদারুর সারের মধ্যে।
খেতে লাঙল ঠেল্‌তো
আমার বাপ-ঠাকুর্দা, নেহাৎ চাষা,
কোনো বংশলতিকা নেই,
আমার বাড়ি, পাতায় ছাওয়া একটা কুঁড়ে,
মানুষের বসবাসের সেটা কেমন ?

Scanned with ACE Scanner

আমার নাম লিখে নাও,
আমি একজন আরব
চুলের রঙ, কালো কুচকুচে
চোখ, বাদামি
চিনে-ফেলার চিহ্ন :
মাথা জোড়া বেদুইন-ফেট্টি,
হাত পাথুরে শক্ত, দাগে ভরা,
মনপসন্দ খানা : জলপাইয়ের তেল আর শাকপাতা
ঠিকানা : ভুলে যাওয়া গোবেচারা এক গাঁ,
রাস্তার নামধাম নেই,
সব পুরুষই মাঠে বা খাদে খাটতে গেছে,
চলবে, এ সব খবরে ?

তোমরা আমার আঙুরখেত করেছ চুরি,
আর, আমি চষতাম যে জমি, তা-ও,
আমার ছেলেপুলেদের জন্যে রেখে যাওনি কিছুই
শুধু পাথরের চাঙর ছাড়া
আমি শুনেছি
তোমাদের সরকার নাকি বাজেয়াপ্ত করবে
এইসব পাথরও।

তাহলে, বেশ তো,
আরও লিখে নাও, গোড়াতেই লেখ :
কাউকে ঘৃণা করি না আমি
চুরি করি না আমি
কিন্তু আমার পেটে আগুন যখন ধরিয়ে দেওয়া হয়,
তখন আমি ছিঁড়ে খাই আমার অত্যাচারীর মাংস
সাবধান, এই খিদে আর রাগ আমার,
—তফাৎ।

সিদ্ধেশ্বর সেন

শান্তির নদী ও যুদ্ধের কামান
জাতিপুঞ্জের কাছে পালেস্তাইন
আনতোয়াই জ্বারা

এই এসেছি আপনাদের কাছে
খোলা হাতে পারাবতের সার
আর আমাদের স্বদেশ, পালেস্তাইন
নিদ্রাজাগর সদ্য সমুৎসুক।
অপেক্ষমান দুই দশক জুড়ে
পেলাম শুধু কথার পরে কথা।
আমাদের এই জখমে বড় জ্বালা
আমাদের এই অস্থিমালায় তাণ্ডব।

এনেছি তবু আপনাদের কাছে
ইরাক থেকে সুগন্ধী লাল গোলাপ
তোড়ায় তোড়ায় দামাস্কাসের ফুল
কোয়েল পাখির প্রহর জোড়া গান,
পাখপাখালির প্রাথিত গুঞ্জন,
ভালোবাসার নিশিজাগর পালা।

কেটে গেছে বহু বছর সময়
ছিন্নভিন্ন ভগ্ন দীর্ণতায়।
স্বভাবে আছে বেপরোয়ার ধাত
আমরা চাই ভালোবাসার টান
বোঝাপড়ার আপোষ রফার খোঁজে
এখন বড় ব্যস্ততার কাল
হাতের মুঠোর এই জলপাইয়ের ডাল
হারিয়ে যেতে দেবেন না আপনারা।

Scanned with ACE Scanner

আমরা এখন এই দুনিয়ায় চাই
ব্যবহারের নতুনতর বিধি।
ভুলে থাকুন, আমরা কাটিয়েছি
বালিয়াড়ি পাহাড় ঘেরা জীবন।
বালিই যদি লেগেছে ভালো মনে,
উইলো যদি জুড়ে থাকে হৃদয়,
আমার বোন ধুয়েছে কেন তবে
আকাশ জোড়া চন্দ্র সূর্য তারা ?
আমার দিদা চেয়ে রয়েছে কেন
আমার আঁখির তারা দুটির পানে ?
আর আমার মায়ের মৃতদেহ কেন
উচ্চতায় ঐ নগ্ন আকাশ ছোঁয়া ?

প্রান্তরে দেখেছি সাধুসন্ত দরবেশ,
প্রব্রজ্যার পদরজে ভরা
স্বদেশভূমির পবিত্র এই পথ
নক্ষত্রের আলোয় পরিস্নাত।
অপরাধের পাহাড় হলো জমা
আমাদের এই স্বদেশবাসীর দ্বারে।
আমরা গাই ভালোবাসার গান
আমরা গাই ভ্রাতৃত্বের গান
আমরা বাড়াই ভালোবাসার হাত
দুনিয়া জোড়া মানুষ জনকে বলি
সে হাতখানি ফিরিয়ে দেবেন না।

অতীতকালে দুঃখ-ভরা মনে
জানিয়েছিলাম আমাদের সব কথা
নানা দেশ আর জাতিপুঞ্জের কাছে
কিন্তু রুদ্ধ দুয়ার, এসেছি ফিরে
কেউ শোনেনি আমাদের সেই কথা।

Scanned with ACE Scanner

কেউ বোঝেনি আমাদের এই ব্যথা
জাগেনি কারও বিবেকে কোনো সাড় ।
বাস্তুহারার স্বস্তিবিহীন দিন
দুর্বার বোঝা করি বহন জীবন ভোর
কত জাতি এলো কত না নতুন জাতি
মুক্ত বায়ুতে অভ্যর্থনা ঘটে তাদের
কিন্তু আমাদের বেলা শুধুই প্রত্যাখ্যান ।
আমাদের যুবজনের নম্র প্রার্থনা
আমাদের নারী শিশুদের বিনীত আবেদন
তোমাদের মধ্যে তোলে নি কোনো সাড়া ।

তারপর এলো, আমাদের রণবেলা
এল রক্ত ঝড়ানোর দিন
শহিদেরা এলো, নিহতেরা এলো কত,
আবেদন, নিবেদনের প্রহর আজ শেষ,
বেঁধেছি আমরা চোখের জলের বাঁধ,
কথার চাইতে এখন অনেক উচ্চরবে
বন্দুক থেকে শোনা যায় গুলির কুচকাওয়াজ ।

আমাদের দেশবাসীদের কাছ থেকে
ন্যায় বিচারকে বঞ্চিত করে রেখো না ।
নেকড়ে-স্বভাব হিংস্র প্রকৃতির বলে
ভেড়ার পালের মতো আমাদের বলি দিলে
জাগে আমাদেরও আলিরনখর ঘৃণা ।
আমরা চাইছি, সন্ত্রাস দূর হোক,
আমাদের পূত পবিত্র স্বদেশ জুড়ে
শান্তির নদী প্রবাহিত হতে থাক্ ।
আমরা চাইছি, নতুন চিন্তার জন্ম হোক্,
শান্তি, বিচার, স্বস্তি আসুক আমাদের দেশে ফিরে ।

Scanned with ACE Scanner

রাতের জেরুজালেমবাসী

ইজাম হামুদ

রাত্রি, তুমি আমায় বলো
কোথায় আমার ছোট্ট বাড়ি
কোথায় আমার ঘর-সংসার ?
কোথায় গেল শহরবাসী
কোথায় আমার প্রতিবেশী
টেবিল-ঘেরা বন্ধু-স্বজন ?
গতকালও ছিলাম আমি তাদের কাছে
আজ তারা সব কোথায় গেল ?
হে রাত্রি, আমায় তুমি সবই বলো।

হে রাত্রি, বলো তুমি
কোথায় আমার সুখের বাসা ?
লুকিয়ে রাখা হৃদয় আমার
যেখান থেকে চুপি চুপি
পাখির গলায় গাইত গান,
লাল গোলাপের সঙ্গে নিত্য করত খেলা,
কোথায় সেই ভালবাসার
বুকের তাপে গরম করা
আমার প্রিয় ঘর-সংসার ?
এসব ছেড়ে যাইনি কোথাও
এরাও আমায় যায় নি ছেড়ে, দুরান্তর
এবার কেন ছাড়তে হলো আমার সেই ছোট্ট ঘর
এবং আমার মাণিকসোনা ছেলেমেয়ের কণ্ঠস্বর ?
আর কিছু না,
মনের কোনে ঘুরছে শুধু এদের ছায়া
হে রাত্রি, বলো তুমি
কোথায় এরা লুকিয়ে আছে, প্রিয়তমা আমার জায়া।

রাত্রি, তুমি আমায় বলো
কোথায় গেল অনাঘ্রাতা কুমারী আর দেবদূতেরা
কোথায় আমার জন্মভূমি, সুধায় ভরা স্বর্গোদ্যান ?
কোথায় আমার প্রিয় পাহাড়, নদীর তীর, স্রোতের টান ?
হে রাত্রি কাউকে শুধাও
কোথায় আমার সন্তানেরা
কোথায় আমার ছোট্ট বাড়ি
লাল টুকটুক হৃদয় আমার ?
হে রাত্রি, আমায় বলো
মাঠের সবুজ কোথায় উধাও
কোথায় গেল আমার প্রিয়
ভালবাসার ঘর-সংসার ?

ধনঞ্জয় দাশ

Scanned with ACE Scanner

রাফার শিশুরা ঃ ১

শামী-আল্‌-কাসিম

লক্ষ ক্ষতের রক্তে কাটছো পথ—
ট্যাঙ্কগুলো পিষছে গোলাপের ঝাড়।
সবই তোমার ইচ্ছায় মালিক।

সবই তোমার ইচ্ছায় মালিক—
অদ্ভুত রূপোলী রাতে
তোমার হানাদারেরা ভেঙ্গেছে জানালার কাঁচ
আর আমি দেখেছি
বারুদে জ্বালানো আমাদের ক্ষেত,
আমাদের সৃষ্টি, আর আমাদের গানের কলিগুলো।

ছেলেহারা মায়ের,
দিগন্ত ছাপান মেঘের মত কালো চুল, ছিঁড়েছে তোমার জুতোর কাঁটা।
শহরের চৌরাস্তায়
ফাঁসিতে ঝুলিয়েছ আমার আনন্দকে,
তোমার বোমারুগুলো—
ছারখার করেছে শৈশবের স্বপ্নকে
সবই তোমার ইচ্ছায় মালিক,

সবই তোমার ইচ্ছায় মালিক ;
রামধনুকেও করেছ লুট।
আজ রাতে
রাফার শিশুরা ঘোষণা করেছে—
সোনা বাঁধানো দাঁত উপড়ে
যে মেয়ের লাস ফেলে গিয়েছ,
তার দিকে ঘৃণা ছোটানোর দিন শেষ।

Scanned with ACE Scanner

আজ রাতে
রাফার শিশুরা জানতে চেয়েছে—
ক্যানডির বদলে বোমগুলোর কি প্রয়োজন ?
আরব শিশুরা কেন অনাথ হয় ?
আজ রাতেই জানতে চেয়েছে তারা।
আর ধন্যবাদ জানিয়েছে তোমায় ;
সবই তোমার ইচ্ছায় মালিক,
শিশুরা বেড়ে হয়েছে মানুষ।
আর তাই আজ রাতে
রণক্ষেত্রে তারা জবাব নিতে গেছে।

মানব মুখার্জী

Scanned with ACE Scanner

বিচ্ছেদের পর
আবু সালমা

আমাকে জিজ্ঞেস করো না, কারণ আমি বলতে পারব না,
কেমন করে আমি বিলাপ করি স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর জন্যে,
পালেস্তাইনের বহুদূর থেকে প্রতিটি সময়
আমি দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুতের ঝলক,
আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে এবং বিগলিত করে আমার আত্মা।
সমুদ্র-ঢেউয়ের মত আমরা ফিরে এসেছি সমতল ছুঁয়ে,
আকাশে মেঘের মত আমরা ছড়িয়ে পড়েছি চারপাশে,
আমাদের ভালোবাসা তোমাকে পাওয়ার জন্যেই,
হে পালেস্তাইন,

আমরা সহ্য করেছি যন্ত্রণা এবং পীড়ন।
তুমি যদি জিজ্ঞেস কর কোথায় আমরা আছি,
আমাদের একটাই উত্তর : তোমার সঙ্গে।
এবং তোমার মাটি থেকে আমাদের বিচ্ছেদ,
মাটির কাছেই আমাদের শুধু আনছে টেনে।
প্রতিটি দেশে আমরা প্রোথিত করেছি আমাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা,
যা শুধু তীর এবং বল্লমের ফসল ফলাতে পারে,
আমাদের ছাড়াছাড়ি সত্ত্বেও তুমি আছ আমাদের হৃদয়ে,
যুগ যুগ ধরে, অবমাননায় এবং বিক্ষেপে।
কিন্তু তোমার খেলার মাঠে আমাদের দেখা হবে আবার,
বয়সের ভারে কেউ কেউ এখন বৃদ্ধ, কেউ কেউ এখনও তরুণ,
এবং আমরা নতজানু হয়ে চুম্বন করব তোমার পাহাড়,
তোমার সৈকত, তোমার নুড়িগুলো এবং তোমার মাটি।

দিলীপ সেন

Scanned with ACE Scanner

ঈশ্বরের কাছে প্যালেস্তাইন শিশুদের
চোখের জলে ভেজা কিছু প্রশ্ন

১

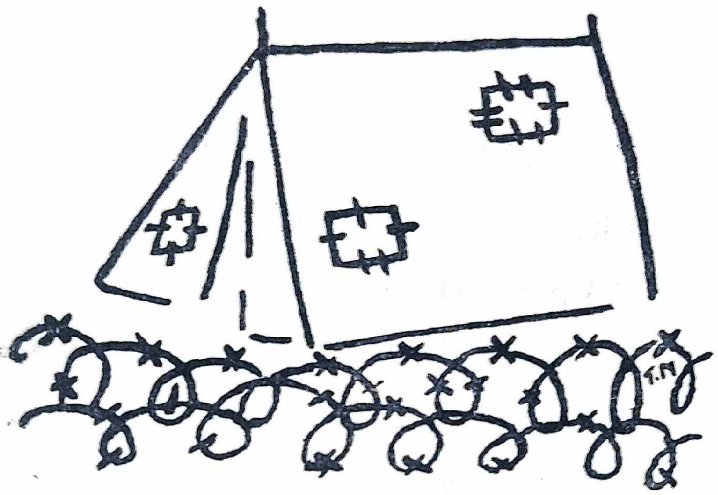

আল্লা
তোমায় পাঠাচ্ছি আমি
আমার বাড়ির একটা ছবি।
তোমার কি মনে হয়
এই বাড়িটায়
ভালমতো বাস করা যায়?

উত্তর দিয়ো কিন্তু
প্যালেস্তাইন শিশু

ধরিত্রী রায়

Scanned with ACE Scanner

২

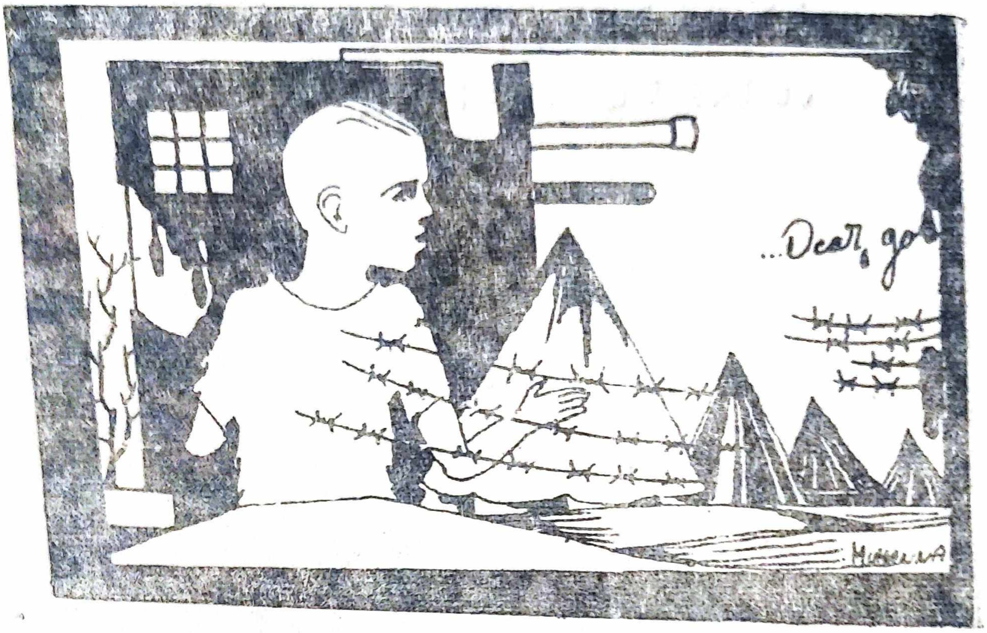

আল্লা

মা মণি বলেছে
আমরা একদিন যাব ফিরে আমাদের ঘরে,
যে ঘর আমরা ছেড়ে এসেছিলাম
বহুকাল আগে অনেক ব্যথা পেয়ে।
আমি খেলতে পারব আমার
পুরোনো বন্ধুদের সাথে
আমি শুতে পারব রাতে
আমার সেই বিছানায়।
সত্যি কথা বলছি তোমায়
বিশ্বাস হয় না মোটে আমার এসব কথা,
সেই সুদিন যখন আসবে ফিরে
তাকিয়ে হয়ত রইব আমি
অবাক চোখ মেলে।

আদর নিয়ো আমার
একজন পালেস্তাইন শিশু

ধরিত্রী রায়

Scanned with ACE Scanner

৩

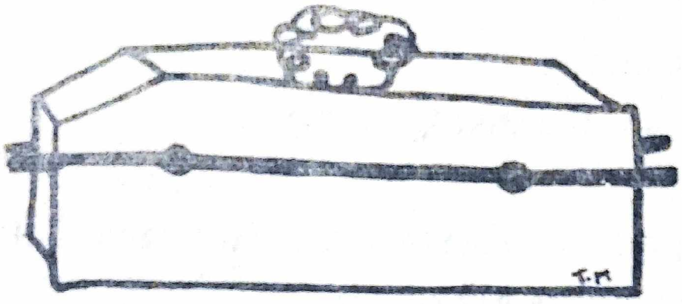

হে আল্লা
আমার মা
প্রতিদিনই কাঁদে
যখন এমনতরো বাকসো
কাউকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখে।
ওরা বয়ে নিয়ে আসে প্রতিদিন
খুঁড়ে চলে বালি
তারপর কবর চাপা দেয় ওটাকে।
হে আল্লা
তুমি তো সবই জানো
তুমিই বলো
ঐ বাকসো দেখে
আমার মা কেন চুপি চুপি কাঁদে!

তোমার প্রিয়
পালেস্তাইনের এক শিশু

ধরিত্রী রায়

Scanned with ACE Scanner

ওদের আগ্রাসনকে আমরা ঘৃণা করি
জনৈক মহিলা কবি

সময় ঃ মধ্যরাত্রি

তারিখ ঃ মে মাসের শেষ, জুনের শুরু

ঘুমের ভেতর আমরা স্বাধীনতার সুখকর স্বপ্নে বিভোর ছিলাম।
আচমকা আমরা জেগে উঠে দেখলাম,
আগ্রাসী সেনার দল।
কারা ?
দরজা খোল্!
আমরা দরজা খুলে দিয়েছিলাম।
রাইফেল উঁচিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে,
হিংস্র দৃষ্টিতে ওদের চোখ কি ভীষণ জ্বলছিল।
আমরা বললাম তোমরা
মানবতার শত্রুরা—
ঈশ্বরের নামে তোমরা উগ্র ইহুদীবাদের সন্তান,
কি চাও তোমরা আমাদের কাছ থেকে ?
তোরা, অভিশপ্ত ব্যালফোরের সন্তান।
পোশাক পর্ এখুনি,
ক্রোধে ওরা চিৎকার করে বলল বাড়ির মালিককে।
এই দেখ্ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। শোন্—
ওরা পড়ে গেল।
তোর নাম সই কর এখানে।
পোশাক পরে নে এখুনি।
সে সাজ ঘরে গেল। ওরা তাকে চোখে চোখে রেখে তার পিছু নিল।
যেন সে বোমা আনতে চলেছে।
আমাদের দৃষ্টি ছিল বোমা বর্ষনের মতো,
আমাদের অনুভূতির স্পর্শ ছিল বুলেটের মতো,
নীতিবোধ উর্ধ্বে।

Scanned with ACE Scanner

আমরা যে তাদের আগ্রাসনকে ঘৃণা করি
কিন্তু একটা প্রমান করে দেখার আশায়
তন্ন তন্ন করে সারা বাড়িটা খানাতল্লাসের পর
ওরা তাকে ধ'রে নিয়ে গেল।
ওরা যে আমাদের অধিকারগুলোকে পায়ে পায়ে পিষে ফেলছে
প্রমাণ করতে চাইছিল আমরা তা'জানি।
ওরা তাকে কারারুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু পারে না
তার স্ত্রী-পুত্রের অনুভূতিকে বন্দী করতে।
তার গ্রেপ্তারে আমরা ভেঙে পড়েছি ঠিকই ; কিন্তু আমরা
শ্রদ্ধা করি তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং গর্ব বোধকে।

দিলীপ সেন

Scanned with ACE Scanner

ক্রোধ
মাহমুদ দারবিশ

অন্তরের অনুভূতিগুলি আমার
পুড়ে হয়েছে অঙ্গার
উৎসারিত আগুনের তীব্র শিখা
আমার দুঠোঁটের ফাঁকে
কোন সে অসভ্য দেশ
অথবা নরক থেকে এসেছো তোমরা
ক্ষুধার সর্বগ্রাসী দানবের মত ?

আমারই দুঃখ আমারই বেদনার প্রতি
নিয়েছি আমি আনুগত্যের শপথ
ক্ষুধা আর নির্বাসনের সাথে
হাতে হাত বেঁধেছি জোট
হাতের মুঠোয় আমার বন্দী ক্রোধ
ক্রোধে আরক্ত এখন আমার মুখ
ক্রোধের বিগলিত উষ্ণ ধারা
প্রবাহিত আমার শিরায় শিরায়
কাজেই আসা করোনা এখন
মৃদুস্বরে ভাঁজব আমি গানের কলি
জঙ্গলের আইনী রাজত্বে
ফুলদেরও বনতে হয় জংলী।

আমার ক্লান্ত কথাগুলি অবশেষে পাবে বিশ্রাম
আমারই বেদনার পুরোনো ক্ষতে
এসবই তো আমার কষ্ট ভোগ :
প্রচণ্ড আঘাতে কম্পিত করে ভূমি
বিদীর্ন করে আকাশ
আমি এখন ক্রুদ্ধ, এটাই যথেষ্ট
কিন্তু মনে রেখো আগামীতে বিপ্লব আসছে।

সলিল সাহা

Scanned with ACE Scanner

গাছ
ফাদোয়া তুকান

সারি সারি গাছ
বলবান গাছগুলো
গাছ কি কখনও মরে
লোহিত নদীরা শুধাল
সেকথা গাছকে।

বৃক্ষ তোমার শিকড় ভিজানো মদে
তোমার শরীর নিঙড়ানো সেই মদ
ফিলিস্তিনির শিকড় ও যেন বা বৃক্ষ
সে-গাছ কখনও মরে ?
পাহাড় ছাড়িয়ে সে-শিকড় নেমে যায়
নেমে যায় ঘন গভীর মাটির তলে।

গাছ, তুমি দিনে দিনে শুধু বাড়বে
তোমার শরীর পাতায় এবং পল্লবে ভরে উঠে
ঘন উজ্জ্বল সবুজ
আকাশের এই সূর্যের নীচে
পাতায় পাতায় বাজবে
হাসির শব্দ।
উড়ে যাবে নীলে
দূর সূর্যের দিকে।

নীড়ের পাখীরা
ফিরে আসবেই
ফিরে আসবেই
ফিরে আসবেই
নীড়ে।

চিত্ত ঘোষ

Scanned with ACE Scanner

আশা

মাহমুদ দারবিশ

তোমার থালার
এখনো একটু মধু রয়ে গেছে।
ওটুকু বাঁচাতে
মাছিগুলিকে হটাও।
এখনো খোয়া যায় নি
তোমার বাড়ির মাদুর আর দরজার পাল্লা দুটো।

দরজা বন্ধ কর,
শীতের কামড় থেকে তোমার বালবাচ্চাদের বাঁচাও
এ-বাতাস তো কম হিমেল নয়
আর বাচ্চাদের ঘুমোনোটাও কত জরুরী
আগুন খুচিয়ে তুলবার
কয়েক টুকরো কাঠ এখনো মজুত
মজুত কফি
আর এক বাণ্ডিল আগুন।

অমিতাভ দাসগুপ্ত

Scanned with ACE Scanner

মৃত্যুকে পেছনে ফেলে জেগে ওঠো
তোয়াফিক জায়াদ

মৃত্যুকে পেছনে ফেলে জেগে ওঠো
পাত্রের শেষ তলানীটুকুও গিলতে হয়েছে আমাদের
গিলতে হয়েছে আমাদের সবাইকে
আমাদেরই লাল তেতো মদ
ইতিহাসের উন্মাদনায়
আমাদের দেওয়া হয়েছে বলি
বলি হয়েছি নিরীহ মেষশাবকের মত
রক্তমজ্জায় অপমানের তীব্র যন্ত্রনা নিয়ে
পালিয়েছিলাম আমরা সবাই
পালিয়েছিলাম এক ঝাঁক মরালীর মত
যাই হোক—এখন উত্তাল ক্রুদ্ধ সমুদ্রের
বেলাভূমি পর্যন্ত বিস্তারিত আমাদের পেশীর সেতু
যার প্রতি আমরা কখনো হারাইনি আমাদের বিশ্বাস
আমাদের প্রতি সেও করেনি কখনো প্রতারণা
হে উজ্জ্বল সোনালী ধরিত্রী
গজদন্ত রক্তাক্ত চুনীর মাতৃভূমি
তোমার প্রতি আমাদের ভালবাসা
ভালবাসার চেয়েও তীব্রতর
সুতরাং—মৃত্যুকে পেছনে ফেলে জেগে ওঠো
যদিবা পালাতে চায় আগামী ভবিষ্যত
দেবনা তাকে আমরা উড়ে পালাতে
শেষ হয়ে যাইনি আমরা এখনও
যাইনি হারিয়ে
আমরা গড়েছি নিজেদের—আবার
নতুন করে
আর একবার……

ধরিত্রী রায়

বেপরোয়া

মাহমুদ দারবিশ

তুমি জোর করে বাঁধতে পারো আমায়,
না দিতে পারো লেখার কাগজ আর সিগারেট
মুখ বন্ধ করতে পারো ঠেসে দিয়ে কাদামাটি
কিন্তু কবিতা আমার হৃদয়ের তাজা খুন,
চোখের পানি আর রুটির নুন
লেখা হবে সে যে নখের আঁচড়ে,
চোখের আলোয় ছুরির দাগে
আমি গাইব তাকে জেলের কন্দরে
স্নানের ঘরে
আস্তাবলে
চাবুক খাওয়ার ক্ষণে
শৃঙ্খল বন্ধনের দারুণ যন্ত্রণায়
দু-হাত যখন বদ্ধ হাতকড়াতে
অন্তরে আমার হাজারো কোকিল তোলে তান
আমি গেয়ে উঠি লড়াইয়ের গান।

সলিল সাহা

Scanned with ACE Scanner

ফাঁসি লটকানো আরব
সালেম জুবরান

ফাঁসি লটকানো আরব
শিশুদের কিনে দেওয়ার পক্ষে
সবচেয়ে ভাল খেলনা।
হে নাৎসী শিবিরে নিহত আত্মা,
ফাঁসি লটকানো ওই লোকটা
বার্লিনের ইহুদী নয়,
আমার মতই আরব।
তোমাদের আত্মীয় বা নাৎসী বন্ধুরা
ইহুদী তীর্থভূমি
জেরুজালেমে ওকে খুন করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র

Scanned with ACE Scanner

রাফার শিশুরা ঃ ২

শামী-আল-কাসিম

বেয়নেটের মুখে গাঁথা সূর্য—
কিছুই না—একটা উলঙ্গ লাস,
সকালের রশ্মির মত
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুইয়ে পড়া।
ঘৃণার মন্ত্রে উচ্চারিত প্রার্থনাকে ছাপিয়ে
জেগে থাকে একটা মুখ।
যেখানে সকালের রশ্মির মত
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ে।
দখলদাররা কুত্তার মত গর্জায়
"কে তোর সঙ্গী ?"
ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়—সকালের রশ্মির মত
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়া।

ঠিক তখন থেকেই কার্ফু বলবৎ হয়—

আবদুল্লার কথাগুলো ছিটকে আসে কার্তুজের মত—
প্রার্থনাগুলো পাখীর মত জন্ম নেয়।
হ্যাঁ আমি মিলিটারীর গাড়ীর ওপর পাথর ছুঁড়েছি,
ছড়িয়েছি ইস্তাহার,
আর সতর্ক করেছি বন্ধুদের
আজ্ঞে হ্যাঁ—আমিই দেওয়ালে দেওয়ালে
সত্যি কথাগুলো লিখে এসেছি ;
ওরা যখন আতঙ্কে নীল,
আমি তখন তুলি আর নাগাল পাবার চেয়ার নিয়ে
অন্য মহল্লায়, অন্য দেওয়ালে।
যাদের নাম আমি কখনই জানাব না
সেই বন্ধুদের নিয়ে আমিই শপথ নিয়েছি—
যতক্ষণ আমাদের পাড়ার রাস্তায়,

যতক্ষণ আমাদের শহরের মহল্লায়,
শত্রুর বেয়নেট ঝলসাবে,
ততক্ষণ প্রতিরোধ
ততক্ষণ লড়াই।

সবশেষে সকালের রশ্মির মত—
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চোয়ানো বন্ধ হলে
আদালতের নথি জানায়
অপরাধীর বয়স ছিল দশ।

বোমার আঘাতে গাছখানা গেছে ভেঙ্গে
শহরের গেট বন্ধ হয়েছে আজ—
দুঃখে অথবা মোম লাগালেই হয়
অথবা রাতের কারফুর ধাক্কায়

মেয়েটা গিয়েছিল রুটি আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে একজন আহত মানুষের কাছে,
ফিরে আসতে মাঝ রাতে, ঘরে ফিরতে অতিক্রম করতে হবে এক
চিলতে পথ, যার ওপর চোখ মেলে রয়েছে আক্রমণকারীর রাইফেলের নল।

বোমার আঘাতে গাছখানা গেছে ভেঙ্গে
বোমার টুকরো—শত এই মত চাই
রক্তের ধারা—বার হবে কোথা দিয়ে
খোলা ছিল শুধু একখানি দরজাই

সে লাফ দিল, পড়ল যুঁই গাছের পাশে,
পাম গাছের আড়ালে,
আতঙ্ক চাপা দিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছিল। আবার লাফ।
উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়লো, বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা—দাঁড়াও। একটি
মেয়ের জন্য উদ্যত ছিল মাত্র পাঁচটা রাইফেল।

সকাল বেলায় বিচার-সভাও হোল,
বিচার অথবা চোর ডাকাতের হাট
অপরাধী তাতে নেই কোন সন্দেহ
বয়স শুধু হবে মেরে কেটে তার আট।

মানব মুখার্জী

Scanned with ACE Scanner

একজন মানুষকে
মাহমুদ দারবিশ

মুখ তার বন্ধ করে শেকলে
বাঁধল তাকে মশানের পাথরে
তারপর তারা বলল : তুই একটা খুনে

কেড়ে নিয়ে তার মুখের অন্ন
পরনের পোষাক আর পরিচয় লিপি
ছুঁড়ে দিল তাকে মৃত্যুগহ্বরে
তারপর তারা বলল : তুই একটা ছিচঁকে

রুদ্ধ করে সমস্ত বন্দরের দ্বার তার কাছ থেকে
ছিনিয়ে নিল তার আদরের ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটিকে
তারপর তারা বলল : তুই একটা উদ্বাস্তু

তোমার অশ্রুভেজা চোখ আর রক্তাক্ত হাতকে বলো
রাত্রির অন্ধকার যাবে কেটে
রইবে না কোন বন্ধন আর বন্দিশালা
অতলে হারিয়েছে নীরো, কিন্তু রোম বেঁচে আছে আজও
তার চোখের আগুনে লড়ে
একটি যবের শুকনো ছরা থেকে
ঝরে পড়া বীজে
লক্ষ্য সবুজ শীষ
মাথা তোলে প্রান্তরে।

সুলতান আহমেদ

Scanned with ACE Scanner

জয় পরাজয়
তৌয়াফিক জায়াদ

কাল আমরা হাতের আঁজলায় ধরা জলে ভেসে থাকি নি,
আজও ও গণ্ডুষে ডুবব না।
এই পথ ধরে তারা পুবে গেছে
কালো মেঘে শিশুদের গোলাপের শস্যের শিশিরের
মৃত্যু হেনে হেনে
ঘৃণা হিংসা কবর ও মরণ টেনে টেনে

যতদিন, যতদিন যাক,
যতদিন, যতদিনই থাক
ফেরার সময় তারা এই পথ ধরে ফিরে যাবে।
বলো না, 'এ জয়',
পরাজয়াধিক এই জয়, এই জয় পরাজয়াধিক।

ওপরে ওপরে নয়,
তাদের গভীরে অপরাধ।
আলোর শপথ
এ মাটির একটি দানাও আমরা হারাব না
লোহার জ্বলন্ত গোলাগুলি
আমাদের হারাতে পারবে না।
এটাতো হোঁচটমাত্র,
দুঃসাহসী অভিযাত্রী যেমন হোঁচট খেতে পারে।
এক কদম পেছনে সরেছি
দশ কদমে আগ বাড়বার আগে।

শ্যামল রায়

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনের একজন প্রেমিক
মাহমুদ দারবিশ

তোমার আঁখিদুটি যেন কাঁটা হয়ে
আমার বুকে বেঁধে।
যদিও বেদনায় হই নীল
তবু এ দুটিকে আমি ভালবাসি
সঙ্গোপণে আড়াল করি তাদের
ঝড়ের প্রকোপ থেকে।
দুঃখ আর রাত্রির অন্ধকার থেকে
রক্ষা করে তাদের
হৃদয়ে রাখি গেঁথে
আর সেই ক্ষত থেকে
হাজারো নক্ষত্রের দীপ্তি হয় উদ্ভাসিত।
আমার বর্তমান তার ভবিষ্যতকে প্রস্তুত করে
আমার আপন আত্মার চেয়েও প্রিয় সে আমার।
যখন চোখে তার চোখ মেলে, আমি তক্ষুনি যাই ভুলে
বন্ধ দরজার ওপাশে একদা ছিলাম আমরা
মুক্ত সুখী দম্পতি!

তোমার কথা
সে তো কথা নয় গান
আমি কতবার চেয়েছি গাইতে,
কিন্তু দুঃসহ যন্ত্রণা ঘিরল আমাদের,
স্তব্ধ করল বসন্তের গান গাওয়া ঠোঁটদুটিকে।
তোমার সেই মধুর কথারা গেল উড়ে
সোয়ালো পাখির মতো ডানা মেলে,
আমাদের বাড়ির উষ্ণতা ছেড়ে
সেই সাথে ছেড়ে গেল শরতের সোনালী দিন

Scanned with ACE Scanner

তোমার পিছু পিছু, যেখানে আছে প্রেম
আছো তুমি।
মুগ্ধতার দিন হল শেষ।
আমার ব্যথা সহস্র কথা হয়ে পড়ল ঝরে
আর শব্দের সেই ঝঙ্কারগুলো নিয়েছি আমরা কুড়িয়ে।
যদিও পারিনি আমরা ঠিক করে গাইতে
আমাদের মাতৃভূমির জন্য শোকগাথা।
আমরা বেঁধেছি সেই গান বীণার সুরে,
আমাদের বিয়োগান্ত নাটকের মুখবন্ধে
আমরা বাজাব সেই সুর
শুনবে রাঙাভাঙা চাঁদ আর পাহাড়।
কিন্তু, হায় তোমাকে পড়েনি আমার মনে
কত সব অজানা কণ্ঠস্বরের মাঝে,
তোমার চলে যাওয়া
অথবা আমার নীরবতা
কি স্তব্ধ করল বীণা ?

গতকালই তোমাকে দেখেছি বন্দরে
একজন নিঃসঙ্গ যাত্রী তুমি।
অনাথের মতো ছুটে গেছি তোমার পানে।
প্রশ্ন করি আমাদের পূর্বপুরুষদের বিচক্ষণতাকে :
চির সবুজ কমলালেবু কুঞ্জকে যদি আটক করো
পিঞ্জরে, অথবা কর নির্বাসিত অথবা দাও কোনো
বন্দরে চালান,
দীর্ঘ ভ্রমণ নোনা হাওয়ার ছোঁয়া, আর
ঘরে ফেরার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তারা
সবুজ থাকে কেমন করে ?
আমার দিনলিপিতে লিখেছি আমি :
'বন্দরে দাঁড়িয়েছিলাম একা
তাকিয়ে দেখি শীতের হিমেল স্পর্শ পৃথিবীর বুকে।
আমাদের জন্য শুধুই উচ্ছিষ্ট কমলালেবুর খোসা

Scanned with ACE Scanner

আমাদের পিছনে ধূ ধূ মরুভূমির নিঃসঙ্গতা।'
দেখেছি তোমায় আমি বন্য কাঁটা গোলাপ আবৃত পাহাড়ে,
মেঘ বিহীন মেঘপালিকা রূপে,
করেছি অন্বেষণ পুরোনো ধ্বংশস্তুপে।
যখন ঘরছাড়া—অনেক দূরে আমি
তুমি ছিলে আমার উপবন।
আমার হৃদয়ের দরজা জানালা আজ বন্ধ
পাথর সিমেন্টের স্তুপে
হে হৃদয়, আমি ঐ বন্ধ দুয়ারে ধাক্কা দিতে চাই।

দেখেছি তোমায় আমি, সুগভীর ইঁদারার জলে
শস্যাগারে—অতীব ক্লান্ত তুমি।
দেখেছি কাফেতে তোমায় রাতের আঁধারে
পরিচারিকা তুমি ভোজের টেবিলে।
দেখিছি তোমায় আমি আঘাতে বিদ্ধস্ত অশ্রুভরা চোখে।
তুমি আমার নিশ্বাসের বিশুদ্ধ বাতাস,
তুমি আমার মুখের ভাষা,
তুমি আমার তৃষ্ণার বারি
তুমিই আমার প্রাণবহ্নি।
দেখেছি তোমায় আমি পাহাড়ের কন্দরের মুখে,
মেলে দিচ্ছো দড়িতে তোমার অনাথাদের কাঁথা।
দেখেছি তোমায় আমি একাকী রাজপথে বিপণিতে।
দেখেছি তোমায় আমি
পশুদের খোঁয়াড়ে,
সূর্যের রক্তস্নাত আলোয়,
দীনদুঃখী অনাথদের গানের আসরে।
দেখেছি তোমায় আমি বেলাভূমির বালিতে আর সমুদ্রের নুনে
আরবী জুঁইএর মত সুগন্ধী, শিশুদের মত সরল আর
বসুন্ধরার মতো রূপসী তুমি।
আমার আঁখির পক্ষ্ম দিয়ে বুনে দেব তোমায়
একটি রুমাল অঙ্গীকার আমার

Scanned with ACE Scanner

রঙিন সূতোয় সূঁচ দিয়ে আমি
তুলব প্রেমের কবিতা শুধু তোমারই জন্য,
আর লিখব শুধু একটি নাম
যা একদিন সিঞ্চিত হতো
সঙ্গীতমুখর হৃদয় নিংড়ানো প্রেমে
এখন যেথায় জন্মায় শুধু জংলী কাঁটা ঝোপ।
আমি লিখব এখন একটি বাক্য
যা মধু আর চুম্বনের চেয়েও মধুর ঃ
"ও ছিলো পালেস্তেনীয় এবং এখনও সে তাই আছে।"

কোনো এক সন্ধ্যার উদ্দাম বাতাসে
উন্মুক্ত করেছিলাম আমি ঘরের দরজা জানালা
আমাদের রাত্রির সেই নির্দয় চাঁদকে দেখার আশায়।
অকরুণ রাত্রিকে বললাম ঃ বেড়ার ওপাশে যাও
লুকোও মুখ ঘন তিমিরে।
আমাকে পালন করতেই হবে শপথ সগর্জনে আলোকিত হয়ে।
তোমরাই এখনো আমার অখণ্ডিত বন্ধু আছো
কেননা আমাদের রচিত গান
এখনো তরোয়ালের মতো শাণিত রয়েছে।
তোমরাই এখনো খাদ্যকণার মত শাশ্বত আর বিশ্বাসযোগ্য আছো।
কেননা আমরা রচনা করার পর
আমাদের গানগুলো এখনো আমাদের মাতৃভূমিকে দিচ্ছে প্রেরণা।

দীর্ঘ তালবৃক্ষের মতো আমাদের হৃদয়ে তুমি সমারূঢ়
কোনো কাঠুরের কুড়োল অথবা ঝড়ো বাতাস
পারবে না সরাতে তোমায়।
পারবে না কখনো ছেদন করতে তোমার তরুরাজি
মরুভূমি বা জঙ্গলের কোনো পশু।
কিন্তু হায়, আমি নির্বাসিত আজ
দরজার বাইরে বেড়ার ওপাশে।

Scanned with ACE Scanner

স্থান দিয়ো আমায় তোমার চোখে ঃ
যেখানেই যাও তুমি নিয়ো আমায় সাথে,
ফিরিয়ে নিয়ো আমায় পূর্বের মতো
তোমার দেহের উষ্ণ আলিঙ্গনে আর স্মিত হাসিতে,
তোমার চোখের আলোয় আর হৃদয়ের প্রেমে,
তোমার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর রুটির নুন করে,
মাতৃভূমিতে মাটি মায়ের কোলে।
আশ্রয় দিয়ো আমায় তোমার স্নেহসিক্ত আঁখির কোণে ঃ
গ্রহণ করো আমায় তোমার দুঃখভরা কুঁড়েঘরের স্মারক করে ;
গ্রহণ করো আমায় তোমার বিষাদময় গীতি কবিতার পংক্তি করে ঃ
নিয়ো আমায় তোমার খেলার পুতুল করে
নিয়ো আমায় তোমার বাড়ীর খোলামকুচি করে।

তার আঁখিদুটি পালেস্তেনীয়;
তার নাম পালেস্তেনীয়,
তার স্বপ্ন তার দুঃখ পালেস্তেনীয়,
তার রুমাল, তার শরীর আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
সমস্তই পালেস্তেনীয়,
তার নৈঃশব্দ আর শব্দমুখরতা পালেস্তেনীয়;
তার কণ্ঠস্বর পালেস্তেনীয়,
তার জন্ম তার মৃত্যু তাও পালেস্তেনীয়।

আমি বয়ে চলেছি তোমায়
আমার পুরোনো নোটবইএর পাতায়
আমার গীতি কবিতার মর্মবাণী করে,
আমার জীবন অতিক্রমণের যাত্রাপথ করে।
আমি তোমার নামে শপথ নিয়ে ঘুরেছি
উপত্যকা থেকে উপত্যকায়
কতবার চীৎকার করে বলেছি সবাইকে ঃ
আমি ঐ সব বন্ধুবেশী বিশ্বাসঘাতকদের চিনি,

Scanned with ACE Scanner

যদি সমরাঙ্গন পরিবর্তিত হয় তবুও।
সাবধান
আমার গান করেছে বজ্রকে বন্দী চকমকি পাথরে।
আমি যৌবনের মূর্ত্ত প্রতীক
আমি বীরদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ
আমি মানিনা কোনো সংস্কার
আমি কালাপাহাড়
আমি লিভান্তাইনের সীমান্ত জুড়ে রোপন করেছি কবিতা
যা মুক্ত করে বন্দী ঈগলদের।
তোমার নামে আমি শত্রুদের চীৎকার করে বলেছি :
ঘৃণ্য কীটের দল, যদি কোন দিনে পড়ি ঘুমিয়ে
তাহলেই তোরা চেষ্টা করিস আমার মাংস খেতে,
পিঁপড়ের ডিম থেকে কখনো জন্মায় না ঈগল,
আর কেউটে সাপের ডিমের খোলায়
কেউটের বাচ্চারাই থাকে ঢাকা।

আমি ঐ সব বন্ধুবেশী বিশ্বাসঘাতকদের চিনি,
কিন্তু তার চেয়ে আগে এও জানি আমি
আমি যৌবনের মূর্ত্ত প্রতীক
আর বীরদের মধ্যে বীর
বীরশ্রেষ্ঠ আমি।

সুলতান আহমেদ

প্লাবন ও বৃক্ষ
ফাদোয়া তুকান

সারা আকাশ আবৃত করে অন্ধকারে
দুরন্ত ঝড় যখন উদ্দাম
প্রচণ্ড প্লাবন যখন আছড়ে পড়লো
ভালবাসার এই সবুজ ধরিত্রীর বুকে—
ঝড়ের তীব্রতা তখন
শয়তানের ইঙ্গিতে
ফেলে দিল বৃক্ষটিকে
বহু প্রাচীন বৃক্ষটিকে
উপড়ে ফেললো গোড়া থেকে।
বৃক্ষটি মৃত!

বৃক্ষ, হে বৃক্ষ
তোমার কি মরণ হতে পারে?
শুধায় লাল স্রোতধারার দল।
হে প্রিয় বৃক্ষ
সঞ্জীবনী সুধায় আপ্লুত
নবীন পল্লবের নির্যাসে জারিত তোমার মূল
হে প্রিয় বৃক্ষ, পালেস্তাইনের মূল রাজি
যে অমর মৃত্যুহীন।
তারা পাহাড় পেরিয়ে প্রবেশ করেছে গভীরে
তারা খুঁজে নিয়েছে তাদের পথ
পরিব্যাপ্ত হয়েছে ধরিত্রীর গভীরে।

বৃক্ষ, হে বৃক্ষ
তুমি বেচেঁ উঠবে আবার

Scanned with ACE Scanner

সূর্যস্নাত শাখা পল্লবে,
তুমি ভরে উঠবে সবুজ কিশলয়ে।
তোমায় পাতায় উঠবে হাসির নাচন
কাঁপিয়ে আকাশ বাতাস
হাসি পড়বে ছড়িয়ে।
বুলবুলের ঝাঁক আসবে আবার ফিরে
তাদের বাসায়।
তাদের বাড়িতে।
তাদের স্বদেশে।

তহমিনা চৌধুরী

Scanned with ACE Scanner

উত্তাল জোয়ার

(দেশাত্মবোধক সঙ্গীত)

অজ্ঞাত

বিপ্লব আমাদের বিপ্লব
আমাদের জনগন বিপ্লব
ঝড়ের গতিতে আহা চলেছে এগিয়ে
দুরন্ত দুর্বার।
ফেদাইনের এই অগ্রগতি
রোধ করে সাধ্য কার!
বিপ্লব আমাদের বিপ্লব
ঝড়ের গতিতে আহা পড়ছে ছড়িয়ে!
জনগণ আমাদের জনগণ
আহা চলেছে এগিয়ে দুর্মদ দুর্বার!
জনতার কম্বুকণ্ঠ তোলে আওয়াজ
বজ্রধ্বনি করে ম্লান প্রতিধ্বনি
ওঠে তার ভীষণ ভয়ঙ্কর।
বিপ্লবের জয় রাখতে অক্ষুন্ন
দাঁড়াব দৃঢ়পদে, নেবো প্রতিজ্ঞা
দেবো বলিদান প্রাণ ও সন্তান
পরাজয় রুখতে দেবো একনদী রক্ত!
এসো শ্রমিক এসো কৃষক এসো ছাত্র
নাও প্রতিজ্ঞা ধরো হাল
দাঁড়াও পশ্চাতে জীবন কর পণ।
বিপ্লব আমাদের বিপ্লব
আহা পড়ছে ছড়িয়ে ঝড়ের গতিতে!
বিপ্লব আমাদের বিপ্লব
তুলেছে উর্দ্ধে একহাতে
আমাদের দীপ্ত পতাকা
অন্যহাতে শত্রুনিধনে
সমুদ্যত গুলিভরা রাইফেল

সুলতান আহমেদ

প্রত্যাশা

মাহমুদ দারবিশ

তুমি বলতে পারো :
'কেন আমার ইচ্ছে করে
বিদ্রোহীদের মহ্‌ফিলে
আনন্দোৎসবে মত্ত হতে
রুটির এক ছোট্ট দোকানী হয়ে
আলজেরিয়ায় যেতে
পূর্ণজন্মের সাক্ষী হতে
মেষ পালক হয়ে
ইয়েমেনে যেতে
সর্বহারার বিজয় উৎসবে
হৃদয় মেলাতে
হাভানার পানশালাতে
পরিচারক হতে
পাহাড়কে শোনাতে গান
পাথর বওয়া মজুর হয়ে
আসোয়ানে যেতে !'
না বন্ধু ওকথা বলো না আমায়
ওটা ঠিক নয় ।
নীল নদ কখনো ভল্গার স্রোতে মিশবে না
কঙ্গো আর জর্ডনের ধারা
ইউফ্রেটিসের আনুগত্য প্রকাশ করবে না
প্রতিটি নদীই বহমান তার স্বতন্ত্র ধারায় ।
আমাদের দেশ বন্ধ্যা নয়
প্রতিটি দেশেরই নবজন্ম আসে
যেমন প্রত্যেক বিপ্লবীর সাথে
এক একটি ভোরের সাক্ষাৎকার
নির্দিষ্ট হয়ে আছে ।

ধরিত্রী রায়

Scanned with ACE Scanner

যুদ্ধজয়ের মহফিলে

(দেশাত্মবোধক সঙ্গীত)

অজ্ঞাত

যুদ্ধজয়ের মহফিলে মেলাব হৃদয়
চলেছি যুদ্ধে নেবো প্রতিশোধ।
শপথ নিয়েছি রক্তশপথ
মুক্ত করব মাতৃভূমি, নেবই প্রতিশোধ।

চিরস্বাধীন নবলাসের আমি একজন।
আমিই খানয়ুনিসের সেই মুক্ত প্রাণ।
আমিই আমার স্বদেশভূমি
আগ্নেয়গিরির শিখরমালা
কাহারো কাছে কখনো করিনি নত
চির উন্নত শির এ আমার।
আমি ঝঞ্ঝা আমি অগ্ন্যুৎপাত
আমি ফেদাইন আমিই বিপ্লব।
ডরাইনা কভু মৃত্যুকে
আমি যে মৃত্যুশঙ্কাহীন,
মৃত্যু সে তো একবারই
আসে জীবনে, হায়!
মাতৃভূমিকে করে মুক্ত
হাতে নিয়ে প্রিয় রাইফেল
যাব আমি হৃদয় মেলাতে
যুদ্ধজয়ের মহফিলে।

নিয়েছি শপথ রক্তশপথ
হব না কখনো শত্রুর অধীনত।
শত্রুর সাথে ফেদাইন কখনো বলে না কথা

Scanned with ACE Scanner

বন্দুকের গুলি আর গোলার বিস্ফোরণই
ওদের সাথে কথা বলার একমাত্র ভাষা।
তুলব সুউচ্চে বিজয় পতাকা
মুক্ত স্বদেশভূমিতে অথবা বরণ করব মৃত্যু!
হয়ত একদিন তুলবে মুক্তিসেনারা
আমাদের বিজয় পতাকা
আমারই দেহের উপর
মুক্ত স্বদেশ ভূমিতে,
যুদ্ধজয়ের মহফিলে!

সুলতান আহমেদ

অসম্ভব

তোয়াফিক জায়াদ

অত্যাচার নিপীড়ন করে
বিশ্বাসের অগ্নিশিখাকে ধ্বংস করা
অথবা আমাদের অগ্রগতিকে
এক কদম স্তব্ধ করা
এর চাইতে তোমার পক্ষে অনেক সোজা
হাতিকে একটা সুঁচের ফুটো দিয়ে গলানো
কিংবা নীহারিকার আগুনে মাছ ভেজে আনা,
সমুদ্রে হালচাষ করা
অথবা কুমীরকে পোষ মানানো।
আমরা যে মুক্তিসেনা হাজারে হাজার
লিডা
রামল্যা
গালিলি
ছড়িয়ে আছি সর্বত্র।

আমরা এখানেই রইব
তোমাদের বুকে পাথর চাপা হয়ে
এবং তোমাদের গলায় আমরা বিঁধব
ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো,
আর ক্যাক্টাসের কাঁটা হয়ে,
তোমাদের চোখে আমরা ঝড়ব
আগুনের ফুলকি হয়ে।

আমরা এখানেই রইব;
তোমাদের বুকে পাথর চাপা হয়ে,
আমাদের ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য
তোমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবার অপেক্ষায়

Scanned with ACE Scanner

তোমাদের পানশালায় ধোবো এঁটো ডিস,
তোমাদের কর্তাব্যক্তিদের পানপাত্র দেবো ভরে,
আর ঝাড় দিয়ে দেবো তোমাদের নোংরা রান্নাঘর।

আমরা এখানেই রইব,
তোমাদের বুকে পাথর চাপা হয়ে,
লড়ব অনাহারে,
ছিন্নপোষাকে,
মানব না কোনো বাধা,
গাইব আমাদের গান,
ক্রোধ চেপে বুকে ঘুরব রাস্তায়,
তোমাদের কয়েদখানা ভরাব আনন্দে,
নতুন প্রজন্মের বুকে বুনব প্রতিহিংসার বীজ।
আমরা যে মুক্তিসেনা হাজারে হাজার
লিডা
রামল্যা
গালিলিতে
একসঙ্গে যাব।

আমরা এখানেই রইব
তাহলে যাও তোমরা এবার
চেখে দেখ সমুদ্রের জল।
আমরা এখানেই রইব
পাহারা দেব আমাদের ফসল মাটি দেশ।

আমরা এখানেই রইব
মদের ফেণার মত
সঞ্জীবিত করতে আমাদের আদর্শকে।
আমরা এখানেই রইব
হিমশীতল দৃঢ়তা
নরকের আগুন আর
রক্তাক্ত ঘৃণা নিয়ে বুকে।

Scanned with ACE Scanner

পাথর নিঙড়িয়ে পান করব তৃষ্ণার বারি
ধূলিকণা দিয়ে মেটাব ক্ষুধা
তবু যাব না এখান থেকে।

এখানেই ঝড়াব হৃদয়ের তাজা খুন।
এখানেই আমাদের
অতীত
এখানেই আমাদের
ভবিষ্যত
এখানে আমরা অপরাজেয়
সুতরাং আরো গভীরে আরো গভীরে চল
বিস্তার করো আমাদের শিকর।

সলিল সাহা

Scanned with ACE Scanner

একজন নির্বাসিতের চিঠি

মাহমুদ দারবিশ

তোমার জন্য চুমু আর...একমুঠো ভালবাসা
এছাড়া আর কি বলতে পারি আমি
কোথায় করবো শুরু আর কোথায় যে হবে সারা
সময় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে অনন্তে
আর নির্বাসনে বরাদ্দ আমার জন্য এই মাত্র সব :
শক্ত রুটির একটা টুকরো
স্বদেশে ফেরার প্রবল ইচ্ছে
আর আমার নিরাশার হিজিবিজি লেখা একটা খাতা
তাহলে বলো কোথা থেকে করবো আমি শুরু।

এতদিন যা কিছু হয়েছে বলা
অথবা বলা হবে আজ
আমাকে তো নিতে পারবে না স্বদেশে
ঝরাতে পারবে না এক ফোঁটা বৃষ্টি
অথবা শ্রান্ত ক্লান্ত পাখিদের ডানায়
গজাতে পারবে না নতুন পালখ।

পাঠিয়েছি ইথারে একটি বার্তা :
বোলো তারে আমি আছি ভালো।
চড়াইপাখীদের বলেছি ডেকে :
'তোমরা যদি কোনোদিন যাও তার কাছে
যেওনা ভুলে আমার কথা
বলো তারে ভালো আছি আমি!'

ভালো সব ভালোই চলছে,
এখনও আমার দৃষ্টিশক্তি অটুট
হয়নি আকাশ এখনও চন্দ্রহীন
আমার পুরোনো পোষাক এখনও হয়নি জীর্ণ

Scanned with ACE Scanner

তবে স্বীকার করছি ছিঁড়েছে সেটা এখানে সেখানে
কিন্তু তাপ্পি লাগিয়েছি ভালো করে
এখনও চলবে সেটা বহুদিন।

আমার বয়স এখন পেরিয়েছে কুড়ি
ওগো মা তুমি যদি আমায় এখন দেখতে
জীবনে বোঝা বয়ে বেড়াই এখন আমি—মানুষ হয়েছি
রেস্তোরায় কাজ করি, এঁটো ডিস ধুই
খদ্দেরদের জন্য কফি বানাই
আমার দুঃখী মুখে ঝুলিয়ে রাখি কৃত্রিম হাসি
আহা যাতে তারা পায় ঘরোয়া অনুভূতি।

এখন আমি ধূমপান করি
অন্যান্য যুবকদের মতো
দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে যুবতী মেয়েদের সাথে ইয়ার্কি মারি
মেয়েদের ছাড়া জীবন যে হয়ে ওঠে অসহ্য
এক টুকরো রুটি চেয়েছিল আমার বন্ধু
'খালি পেটে বিছানায়
কাটালে রাতের পর রাত
একজন মানুষের কাছে জীবনের মূল্য কি থাকে।'

ভালোই আছি আমি
আমার কাছে মজুত আছে
এক টুকরো রুটি আর অল্প কিছু শব্জী
রেডিয়োতে শুনলাম আমি
নির্বাসিতদের পাঠানো বার্তা
তারা সবাই বললে: 'আমরা ভাল আছি'
বললে না কেউ: 'কষ্টে আছি আমি।'

কেমন আছেন বাবা জানিয়ো আমায়
এখনও কি করেন তিনি প্রার্থনা
ভালবাসেন কি তিনি এখনও

শিশু, জলপাই গাছ আর এই ধরিত্রীকে
আর কেমন আছে আমার ভাইরা
আমার বাবা যেমন চাইতেন
সেই মতো হয়েছে কি তারা সবাই শিক্ষক।

তুমি কি জানো কেন আমার চোখে আসে জল
ধর কোনো সন্ধ্যায় হয়ে পড়েছি আমি অসুস্থ
রাত্রি কি দেখাবে কোন দয়া আমার প্রতি
একজন বাস্তুচ্যুত যে এসেছিল এখানে
তারপর আর কখনো ফিরে যায়নি স্বদেশে
যার পাদদেশে আমি হবো শায়িত
সেই গাছ কি মনে রাখবে চিরদিন—
যে এই নির্জীব দেহটি ছিল একজন মানুষের
রক্ষা করবে কি সে আমার দেহটিকে শকুনের আক্রমণ থেকে ?

মাগো-মা
জানিনা আমি কেন লিখছি চিঠিতে এসব কথা
জানিনা কোন ডাকে কেমন করেইবা সেটা পৌঁছবে তোমার কাছে
জল স্থল অন্তরীক্ষ সবই তো অবরুদ্ধ
আর হয়ত তোমরা সবাই এখন মৃত
অথবা হয়ত আছ বেঁচে আমার মতো ঠিকানাবিহীন হয়ে।

এভাবে চললে কি কোনো ফললাভ হবে
যার নেই কোনো দেশ—নেই ঘরবাড়ী
নেই নিশান—নেই কোনো ঠিকানা।

গোলাম কবীর

Scanned with ACE Scanner

রাষ্ট্রপুঞ্জের চতুর সুবেশ বাবুমশাইদের প্রতি
সামী-এল-গাশেম

রাষ্ট্রপুঞ্জের চতুর সুবেশ বাবুমশাইরা!
আপনাদের প্রতি অধমের এই বিনীত নিবেদন—
এই ভর দুপুরে গলায় চকচকে টাই এঁটে
চাতুর্যপূর্ণ উত্তেজিত কথার খৈ ফুটিয়ে
আপনারা যে আলোচনা চালাচ্ছেন
আমাদের এই দুঃসময়ে
নানান দেশের প্রতিনিধি বাবুমশাইরা
বলুন—ওতে আমাদের উপকার হবে কতটুকু ?

হে নানাদেশের বাবুমশাইরা,
একবার তাকিয়ে দেখুন
থকথকে শ্যাওলার আস্তরণ জমেছে আমার হৃদয়ে
আর কাচের দেওয়াল জুড়ে
এদিকে চলেছে আপনাদের আলোচনা বৈঠক
চলেছে লম্বাচওড়া বাকতাল্লা
চলেছে গণিকা আর গূঢ়চরদের
ইশারা আর ষড়যন্ত্র
আমাদের এই দুঃসময়ে
বলুন এতে আমাদের উপকার হবে কতটুকু ?

বাবুমশাইগণ,
রাত্রির মধ্যযামে অমনুষ্য পদবাচ্যদের হাতেই
ব্যাপারটা তাহলে নিয়ন্ত্রিত হোক।
পৃথিবীতে আমার যোগাযোগের
সমস্ত সেতুগুলো যাচ্ছে ভেঙ্গে

আমার লাল খুন ক্রমশই
রঙ বদলে এখন হলুদ
আর হৃদয় নিমজ্জিত আজ
নানান প্রতিশ্রুতির কুম্ভীপাকে।

হে নানা দেশের বাবুমশাইগণ,
বেশ, তাহলে আমার লজ্জা আজ পরিবর্তিত হোক মহাপ্রলয়ে
আমার ব্যাথা থেকে ফণা তুলুক কালীয় নাগ,
চকচকে পালিসের কালো চামড়ার জুতোপরা
নানা দেশের বাবুমশাইগণ, তাহলে শুনুন
আমার ক্রোধ, প্রকাশের ভাষা থেকে অনেক তীব্র
আর এই দশক বৃহন্নলা কাপুরুষদের
আর আমার কথা—
আমি তো নিরুপায় দর্শক মাত্র।

আজিজুল্ ইসলাম্

Scanned with ACE Scanner

অল-আসিফার শপথ

মাহমুদ দারবিশ

তবে তাই হোক...
আমি আর এখন মৃত্যুকে করব না পরোয়া
বিলাপ গাথাগুলিকে অগ্নিতে দেব আহুতি
আর ছেঁটে ফেলব পোকাধরা ডালপালা
জলপাই গাছ থেকে
কেন আমি গাইছি আজ খুশীর গান
ভয়ার্ত্ত আঁখিদের মাঝে ?
কেননা অল-আসিফা দিয়েছে আশ্বাস
সুরা স্বাস্থ্য আর সাতরঙা রামধনুর
আর যেহেতু অল-আসিফা
তাগিয়ে দিয়েছে সমস্ত ভয়ার্ত্ত পাখিদের
ছেঁটে ফেলেছে শুকনো ডালপালা সবুজ গাছগুলো থেকে।

তবে তাই হোক...
এখন আমি তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই হতে পারি গর্বিত
অন্ধকার দুঃখের রাতে তোমরাই
আমাদের আলোক বর্ত্তিকা
চলার পথে যদি পাই ক্রোধান্ধ আঁখির ভ্রুকুটি
তাদের বিদ্বেষ থেকে আমাকে রক্ষা করো তোমরা
আমি গাইব এখন খুশীর গান
ভয়ার্ত্ত আঁখিদের মাঝে
কেননা ঝড় উঠবার মুহূর্ত্ত থেকেই
আমি যে পেয়েছি আশ্বাস
সুরা স্বাস্থ্য আর সাতরঙা রামধনুর।

তাস্লিমা খাতুন

Scanned with ACE Scanner

প্রতিক্রিয়া

মাহমুদ দারবিশ

প্রিয় মাতৃভূমি
আমার শৃঙ্খলবন্ধন বর্দ্ধিত করে
ঈগলের দৃঢ় একাগ্রতা
আর একজন শুভচিন্তাবিদের ভাবালুতা
আমার মাঝে,
ত্বকের গভীরে
আমাদের ত্বকের গভীরে আমার জানা ছিল না,
চুপিসারে আলোড়িত করে ঝড়
আর বিভিন্ন শ্রোত হতে পারে এক।

তারা আটক করলে আমায় অন্ধকূপে
সূর্যকরোজ্জ্বল আলোকবর্তিকায় উদ্ভাসিত হলো আমার হৃদয়,
কারার দেওয়ালে তারা লিখল আমার ক্রমিক সংখ্যা,
দেওয়াল পরিবর্তিত হলো সবুজ তৃণভূমিতে,
তারা আঁকল আমার জল্লাদের মুখ,
সেই মুখ মিলিয়ে গেল মুহূর্তে
আলোকিত তন্তুর মতো।
খোদাই করেছি আমি দাঁত দিয়ে
তোমার মানচিত্র কারার প্রাচীরে
আর লিখেছি এই ক্ষণস্থায়ী অমানিশার গান।

পরাজয়কে ঝেড়ে ফেলেছি আমি আঁধারে
আর ধুয়েছি আমার হাত
আলোকের ঝর্ণাধারায়।

জয় তারা করতে পারেনি কিছুই
কিছুই পারেনি জয় করতে

Scanned with ACE Scanner

তারা শুধু কম্পিত করেছে ভূমি
তারা শুধু দেখেছে ললাটের জ্যোতি
আর শুনেছে শুধু শৃঙ্খল ঝঙ্কার।

আর যদি নিহত হই আমি
আমার লক্ষ্য অর্জনের পথে
আমি হবো একজন দরবেশ
আমি হবো একজন চিরসংগ্রামী মানুষ।

আলী আকবর

Scanned with ACE Scanner

রুমাল

মাহমুদ দারবিশ

তোমার নিস্তব্ধতা শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভের মতো,
বহমান বিস্তারিত।
স্মরণে আসে এখন আমার
কেমনে ছুঁয়ে যেত তোমার দুটি হাত
পাখীর ডানার মতো
আমার হৃদয়।
প্রিয়তমা আমার, করো না শঙ্কা,
বজ্র সৃষ্টির ব্যাথা চিন্তা করে,
বিষন্ন দিকচক্রবালে ত্যাগ করো তাকে
কিন্তু আত্মানুশীলিত হও ভিন্ন চিন্তাধারায়ঃ
কর চিন্তা রক্তমাখা চুম্বনের
আর উষর দুর্ভিক্ষের
আর মৃত্যুর, আমার মৃত্যুর
আর সেইসব বিলাপের ব্যথার।

আমাদের বিদায় সম্বর্ধনার রুমালগুলি
এখন শুধুই শবাচ্ছাদন,
পোড়াছাইএর মাঝে যেমন ঘুরে ফেরে বাতাস
আর উপত্যকার গভীরে ওঠে রক্তের ফোয়ারা
এবং নাবিক সিন্ধবাদের জলযানে
কোন এক কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে
প্রবল আকাঙ্ক্ষাগুলি মরে কেঁদে।

প্রিয়তমা আমার,
ফিরে এসো আমার কাছে,
আমাদের বিচ্ছেদে চুপি চুপি কাঁদে রুমাল,

Scanned with ACE Scanner

ফেরাও ফেরাও ওদের বাঁশীর আহ্বানে
আর নয় আর নয় বিচ্ছেদ বিলাপ।

আমার নির্বাসিত হৃদয়ে জন্ম নেয় ধীরে ধীরে
একটি শপথ—নয় আর কান্নার রোল
অগণিত মৃত্যু মিছিল
জয়ের আনন্দে হবে আমাদের পূর্ণমিলন,
তোমার আঁখিদুটি ছাড়া আমি যে অসহায়
হে প্রিয়তমে,
প্রেমসঙ্গীতের স্মারক করে জড়িয়ো না তুমি
আমাদের বিচ্ছেদের রুমালগুলিকে
বরং ঢেকে দাও ঐ রুমালগুলি দিয়ে
আমাদের মাতৃভূমির একটি ক্ষত।

ধরিত্রী রায়

Scanned with ACE Scanner

একজন সৈনিক যে সাদা পদ্মর স্বপ্ন দেখে

মাহমুদ দারবিশ

সে সাদা পদ্মর স্বপ্ন দেখে,
দেখে একটা গাছের সবুজ শাখা,
একটা জলপাই গাছের, ডালপালা ছড়ানো বিশাল,
পাতাগুলো যার গেছে ঝরে।
একদিন সন্ধ্যার আঁধারে
আমাকে বলেছিল সে
স্বপ্নে দেখেছে একটা পাখি
আর লেবুগাছের পুষ্পিত শাখার।
এ স্বপ্নের কি যে অর্থ সে কি কোনদিন
দেখেছে ভেবে মনে
শুধু জানে কোনদিন হয়ত বা এসবের আঘ্রাণ সে পাবে,
শুধু বোঝে কোনদিন হয়ত বা এসব ছুঁতে পারবে সে হাত বাড়িয়ে।

'আহা, আমার ঘর,' বলেছিল সে,
'যেখানে আমার মায়ের তৈরী কফিতে দেবো ধীরে ধীরে চুমুক,
যেখানে বেলাশেষে ফিরব নিরাপদে।'
'তখন এই দেশের কি হবে ?' আমি জিজ্ঞেস করি।
'আমি এই দেশকে জানিনা চিনিনা,' বলে সে,
'স্নেহ মমতায় আবৃত করেনা এ আমায়
আমার আপন ত্বকের মতো,
উত্তাল করে না আমার হৃদয়,
ঝঙ্কার তোলে না আমার শোণিতে,
কবিরা যেমন বলে,
এ যেন একটা পথ চলতি দৃশ্য,
চলার পথে যেমন আমি দেখি রাস্তাঘাট,
দোকান পসার, খবরের কাগজের পৃষ্ঠা।'

Scanned with ACE Scanner

'তুমি কি একে ভালবাস ?' প্রশ্ন করি আমি।
'আহ্, আমার ভালবাসা,' বলে সে,
সে তো রোমাঞ্চকর উদ্দাম,
যেন একপাত্র ফেনিল আসব,
একটা আনন্দময় ভ্রমণ।'
'তাহলে তুমি কি এর জন্য দিতে পার জীবন ?'
'না, বন্ধু না।
আমাকে বেঁধেছে এখানে
আদর্শের বাঁধন আর সেই সব ভাষণ
যা সঞ্জীবিত করে বিশ্বাসকে।
আমি শিখেছি কেমন করে ভালবাসতে হয় আদর্শকে
আর শুধু তাকেই ভালবাসতে নিবিড়ভাবে ;
এখন আমি আর নিই না ঘাসের সুগন্ধ
মাটির গভীরে প্রোথিত শিকড়ের
সবুজ পুষ্পিত বৃক্ষশাখার......'

আমি শুধোই, 'তোমার এই ভালবাসা কার মতো ?
একি তোমায় দগ্ধ করে সূর্যের দাবদাহের মতো,
অথবা যন্ত্রণাবিদ্ধ করে তীব্র বিরহ বেদনায় ?'
আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল,
'প্রেম করতে আমি বন্দুক ব্যবহার করি এখন।
পৌরাণিক ধ্বংশস্তূপে উৎসব কল্লোলে
আর সেই সব প্রাচীন, বহুপ্রাচীন মূর্তি
যার স্থান কাল আর নির্মাতাদের নাম
জানেনা কেউ, তার নৈশব্দে প্রতিধ্বনিত হয় আমার প্রেম।'
তারপর সে বলতে শুরু করল তার
বাড়ি ছেড়ে আসবার সময়কার ঘটনা,
তার মায়ের নিশব্দ কান্নাভেজা মুখ
ওরা যখন তাকে সীমান্তের কোনো এক জায়গায় এনে ছেড়ে দিল,
কেমন করে তার মায়ের শোক
তার শরীরের অনু পরমানুতে জন্ম দিল একটা সঙ্কল্পের
পূর্বে যা কোনোদিন ছিল না সেখানে :

Scanned with ACE Scanner

মৃদ্ধ মন্ত্রকের সিংদরজায়
হয়ত বা কপোতরাও বাঁধতে পারে নীড়,
বৃদ্ধি করতে পারে বংশ……
একটা সিগারেট ধরালো সে,
তারপর তীব্র যন্ত্রনাবিদ্ধ মুখে
যেন রক্তের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছে সে
আমাকে বলল,
'আমি শ্বেত পদ্মের স্বপ্ন দেখেছি,
একটা জলপাই শাখার
একটা পাখির—সতেজ ভোর যার বুকে,
গাইছে সে গান, সুগন্ধী লেবু শাখে বসে…'

'কিন্তু বন্ধু তোমার চোখের সামনে
এখন কি দেখছ তুমি ?'
'আমার সাধিত কর্ম দেখছি আমি,
আমি দেখছি পদ্মের রঙ এখন লাল,
যে লালপদ্ম আমি বিস্ফোরিত করেছি বালিতে,
আমার বক্ষে,
আমার উদরে।'
'তুমি কতজনকে হত্যা করেছ ?'
'আমি হিসাব রাখিনি তার
তবু তুমি জেনো……
আমি পদক পেয়েছি একখানা।'
আর আমি, আমার রক্তাক্ত ক্ষতে পুনরায় প্রবেশ করাই
ছুরিখানা, তারপর বলি—
'তাদের একজনের কথা অন্তত আমায় বলো।'
সে উঠে বসলো সিধে হয়ে
কোলের মধ্যে ভাঁজকরা কাগজখানা
নাড়াচারা করতে লাগলো,
তারপর সে বললো ধীরে ধীরে
যেন আবৃত্তি করছে একটা কবিতা ঃ
'ঈগলের মতো ডানা ছড়িয়ে পড়ল সে পাথরের উপর

যেন ভেঙ্গে পড়ল একটা তাঁবু
যেন ডানা মেলে সে আকাশের ঝিকমিকে
তারাদের চাইছিল ধরতে।
তার বিশাল বোজা চোখদুটি
রক্তধারায় সজ্জিত ;
গলায় ছিল না তার কোনো পদক
ছিল না সে মোটেই যুদ্ধ পারদর্শী,
কোনো শ্রমিক, কৃষক,
অথবা ঐ রকম সাধারণ কেউ,
ডানা ছড়ানো ঈগলের মতো পড়ল সে পাথরের উপর
যেন ভেঙ্গে পড়ল একটা তাঁবু
তারপর মারা গেল...
তার বাহুদুটো
ছিল ছড়ানো, যেন ঝর্ণার দুটো শুকনো খাত,
পরিচয় পাবার জন্য যখন আমি
তার পকেট হাতড়ালাম
দেখতে পেলাম দুটো ছবি,
একটা তার স্ত্রীর
আর একটা তার ছোট্ট মেয়ের।'
'তোমার কি দুঃখ হলো তার জন্য... ?'
সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল, 'মাহমুদ, প্রিয় বন্ধু আমার,
দুঃখ হলো অধরা এক ধূসর সাদা পাখি
যাকে তুমি কোন যুদ্ধক্ষেত্রেই পাবে না খুঁজে।
একজন সৈনিকের কাছে দুঃখ আর দেশদ্রোহিতা সমান।
সমরাঙ্গনে আমি যেন এক যন্ত্রদানব
ছড়াই আগুন, করি ধ্বংশ,
মুক্ত বাতাস আর বিহঙ্গদেরও
করি কালিমালিপ্ত।'

তারপর—
আমাকে বলল সে একটি মেয়ের কথা—তার প্রথম প্রেমিকা,
যে পথে তারা বেড়াত বলল সে সব রাস্তার কথা,

Scanned with ACE Scanner

যা এখান থেকে অনেক অনেক দূরে,
আর যুদ্ধের সম্বন্ধে তার অনুভব,
বেতার, খবরের কাগজের দেশাত্মবোধক প্রচার ইত্যাদি সম্পর্কে তার মনোভাব।
আমার চোখে পড়ল রুমালে মুখ ঢেকে কাশির দমক সামলাবার চেষ্টা করছে সে।
জিজ্ঞেস করলাম তাকে ঃ
'আমরা কি আবার মিলতে পারি না ?'
'হয়ত অন্য কোন সহরে এখান থেকে বহুদূরে', জানাল সে।
আবার আমি ভরে দিলাম তার পেয়ালা, এই নিয়ে চতুর্থবার,
হাসতে হাসতে বললাম তাকে আমি ঃ
'তুমি নাকি চলে যাচ্ছ ? যাবে না নিশ্চয়ই,
তাহলে মাতৃভূমির কি দশা হবে ?'
'আমাকে একটু একা থাকতে দাও,' সে বলল—
'আমি সাদা পদ্মর স্বপ্ন দেখছি,
আর সেই সব আনন্দমুখর পথের,
আর একটি আরামদায়ক উষ্ণ বাড়ীর।
আমি চাই একটি সহমর্মি হৃদয়,
চাই না রাইফেল হাতে বদ্ধ জীবন।
আমি চাই সূর্যালোকে উদ্ভাসিত মুক্ত দিন,
জয়ের সাথে চাইনা স্বৈরতান্ত্রিক উন্মাদনা ;
আমি কোলে নিতে চাই একটি সদা প্রফুল্ল শিশুকে
চাইনা যুদ্ধাস্ত্রের আর কোনো নতুন উদ্ভাবন।
আমি এসেছি এখানে সূর্যের আলো
আর নক্ষত্রের উদয় উপভোগ করতে
আসিনি অন্ধকার আর অস্ত দেখতে।

মরতে চাইনা আমি···,
চাইনা নারীঘাতী শিশুঘাতী এই যুদ্ধে জড়াতে
ধনীদের ইঁদারা আর আঙুর ক্ষেত
তৈলকুবেরদের ধনসম্পত্তি আর যুদ্ধাস্ত্র
উৎপাদকদের কারখানা পাহারা দিতে।'
এবং তারপর আমাকে বিদায় জানাল সে কেননা······
সে সাদা পদ্মর সন্ধান করছে,

সন্ধান করছে একটা পাখির
যে তার হৃদয়ে জমা করেছে সমস্ত শোক
জলপাই গাছের শাখায় শাখায় গায় গান,
যেহেতু সে জানে এসব জিনিস
আঘ্রান করতে পারবে অথবা
হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারবে সে।
সে বুঝতে পেরেছে, বলেছে আমায়,
আহা, আমার ঘর
বেলাশেষে নিরাপদে ঘরে ফেরার পর
তার মায়ের তৈরী কফিতে চুমুক দিতে দিতে,
সে সাদা পদ্মর স্বপ্ন দেখে,
দেখে একটা গাছের সবুজ শাখা,
একটা বিশাল ডালপালা ছড়ানো,
জলপাই গাছের,
পাতাগুলো যার গেছে ঝরে
একদিন সন্ধার আঁধারে
আমাকে বলেছিল সে
স্বপ্নে দেখেছে সে একটা পাখি,
আর লেবু গাছের পুষ্পিত শাখার।
এ স্বপ্নের কি যে অর্থ সে কি কোনদিন
দেখেছে ভেবে মনে।
শুধু জানে কোনদিন হয়ত বা এসবের আঘ্রাণ সে পাবে,
শুধু বোঝে কোনদিন হয়ত বা এসব ছুঁতে পারবে সে হাত বাড়িয়ে।

'আহা, আমার ঘর', সে বলেছিল
'যেখানে আমার মায়ের তৈরী কফিতে দেবো ধীরে ধীরে চুমুক,
যেখানে বেলাশেষে ফিরব নিরাপদে।'
'তখন এই দেশের কি হবে ?' শুধালাম আমি।
'এই দেশকে আমি জানিনা', সে বলে,
'আবৃত করে না এ আমায় স্নেহমমতায়
আমার আপন ত্বকের মতো।'

সলিল সাহা

পালেস্তাইন গল্প

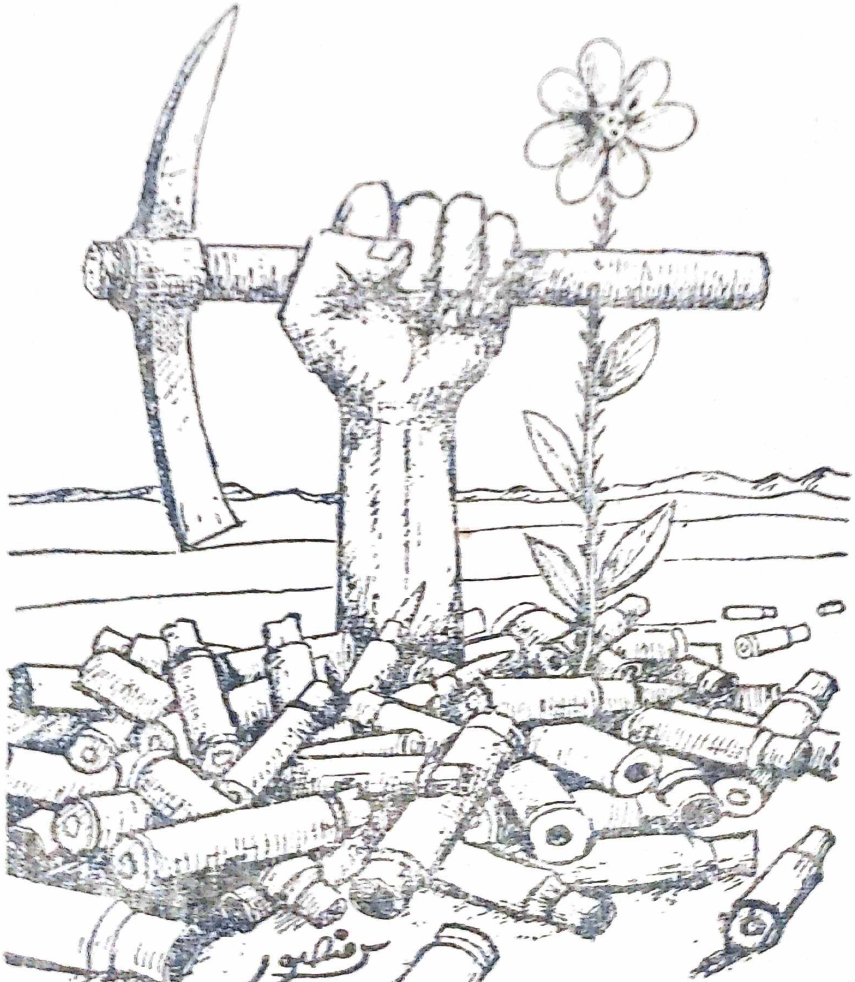

Scanned with ACE Scanner

তিরিশলাখের একজন

গাজি ডানিয়াল

একজন সাধারণ পালেস্তেনীয়ের কাহিনী

নাম আমার
গাজি দানিয়েল,
বয়েস—চব্বিশ,
জন্ম—নাজারেথ,
যীশু যে শহরে পয়দা আমিও সেই শহরেই,
আজ আমার আর নিজের দেশ বলতে কিছু নেই।
আমার হাতে উদ্বাস্তু হিসেবে দুটো পরিচয় পত্র,
একটা পালেস্তেনীয় উদ্বাস্তু বিষয়ক লেবাননী সাধারণ দপ্তরের,
অন্যটা জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম এজেন্সির।
প্রথমটাতে আমি হচ্ছি
ফাইল নম্বর ৩৩২
সিরিয়াল নম্বর ৫৪৫৯৬
আইডেন্টিফিকেশন নম্বর ২৭৩৪
জাতি—পালেস্তেনীয়।
পরের পরিচয় পত্রটা এক সঙ্গে আমার বাবা মা, ছয় ভাই
দুই বোন আর আমার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩২৫৪/৩২০১
জাতি—পালেস্তেনীয়
আপনার কাছে এত কাসুন্দি গাইছি কেন ?
এর কারণ হচ্ছে,
শুনুন,
আমার মতনই রয়েছে আরও ত্রিশ লক্ষ, আমরা একই রকম দুর্দশার কবলে একসংগে। আর আমরা চাই আমাদের এই ত্রিশ লক্ষের এই দারুণ সমস্যার ন্যায্য সমাধানের সন্ধানে সামিল হয়ে আপনিও কদম বাড়িয়ে এগিয়ে আসুন। আমাদের জনগণকে বারবার কি রকম বঞ্চনা করা হয়েছে সেটাই একটা আস্ত ইতিহাস।

Scanned with ACE Scanner

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ইংরেজরা আমাদের দেশ কব্জা করে পালেস্তাইনে তাদের হুকুমদারীতন্ত্র গড়ে তুলল, স্বাধীনভাবে আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।

ইতিমধ্যে ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক বলতে শুরু করেছে পালেস্তাইনে নাকি তাদেরই অধিকার।

তারা নিজেদেরকে কি যেন বলত,

হ্যাঁ—জায়ানিস্ট।

"২০০০ বছর আগে আমাদের ধর্মের লোকরাই তো পালেস্তাইনে বাস করত"—এই ছিল তাদের যুক্তি।

সুতরাং আমাদের দেশ পালেস্তাইনে তাদেরই অধিকার রয়েছে—বটেই তো।

আমরা প্রথমে ইহুদী দেশান্তরী উদ্বাস্তুদের সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলুম।

ইহুদীদের সঙ্গে শত শত বছর ধরে আমরা এক সংগে বসবাস করেছি।

তারা তখন শান্তিপূর্ণ ছিল,

তারা আমাদেরকে শ্রদ্ধা করত, আর আমরা তাদেরকে,

আমরা তাদেরকে রক্ষা করেছি, আশ্রয় দিয়েছি

তখন কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করা মুস্কিল ছিল—

যারা কোনদিন এর আগে পালেস্তাইনের মাটিতে পাও দেয় নি তারাই এবার আমাদের দেশকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে।...

তখন আমি কেবল ন মাসের।

আমাদের পুরো পরিবারকে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে চলে আসতে হল।

আমার বাবা তখন হাইফাতে কাজ করতেন। কাজ ছেড়ে আসতে হল।

সেখানে আমাদের দোকানঘরের দেখা শোনা করতেন মা। সেটা বন্ধ করে দিয়ে চলে আসতে হল।

নাজারেথে আমাদের বাড়ি, সেটা পড়ে রইল। আমার কাকারা আমাদের যে সব জমিজমা চাষবাস করতেন তা বেদখল হয়ে গেল।

আমি তখন বড় হয়ে উঠছি, প্রায়ই রাগে খুন জ্বলে উঠত। মনে প্রশ্ন জাগত, কি রকম সব হচ্ছে, কেন?

আমার বাবা ব্যাপারটা খোলসা করে দিতেন।

ইংরেজরা পালেস্তাইনে হুকুমদারী শাসন কায়েম করার আগেই জায়ানিস্টদের সংগে একটা রফা করে নিয়েছিল—জায়ানিস্টরা মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজদের স্বার্থ বাঁচাবে-আর ইংরেজরা ওয়াদা করল জায়ানিস্টদের জাতীয়ভূমি হিসেবে

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
ব্রিটেনের কি অধিকার এই ওয়াদা করার?
ইউরোপের জায়ানিস্টদের কি স্বত্ব পালেস্তাইনের ওপর?
আমরা যারা পালেস্তাইনের অধিবাসী সন্তান তাদের সংগে কোন আলোচনা করা হল না কেন?
কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।
আগেই বলেছি ক্রমাগত বঞ্চনার জালে আমাদেরকে জড়ানো হয়েছে। এবার আমরাও নতুন করে আসতে থাকা দেশত্যাগী উদ্বাস্তু ইহুদীদের তরঙ্গকে রুখতে শুরু করলুম। ইহুদীদের প্রতি কোন ঘৃণার থেকে নয়, তাদের ওপর আমাদের কোন ঘৃণা ছিল না। তারা আমাদের জিনিসের দিকে লোলুপ হাত বাড়িয়েছিল, সেইজন্যে।
১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ পরপর জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটতে থাকল। এ সব দিয়ে স্বাধীনতা আমাদের আয়ত্তে এল না, কিন্তু আমাদের স্বদেশভূমির প্রতি আমাদের ভালোবাসা আর স্বাধীনতার জন্যে আমাদের আকুতির একটা স্পষ্ট ছবি এসবের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল। ঔপনিবেশিক শক্তি আর জায়ানিস্ট বাহিনীরা দমনমূলক নীতি দিয়ে আমাদের নিরস্ত্র জনগণকে দাবিয়ে রাখতে চাইল।
১৯৪৭ সাল নাগাদ ইহুদী স্মরণার্থীর সংখ্যা হাজারগুণ বেড়ে গেল। তাদের সংখ্যা আমাদের মোট জনসংখ্যার তিনভাগের এক ভাগে দাঁড়াল আর তাদের কবজায় এসে পড়ল আমাদের দেশের মোট জমির শতকরা সাত ভাগ। এই জমির কিছুটা তারা কিনেছিল ঠিকই, তবে অনেক জালিয়াতির সাহায্য নিয়েই তারা তা বাগিয়েছিল। আর বেশির ভাগ জমিই ইংরেজরা পঞ্চায়েতী জমির থেকে ইহুদীদের দিয়ে দেয়। আমাদের জমি তাদেরকে দেওয়ার কোন অধিকারই ইংরেজদের ছিল না। এই সব জমিই ছিল অছিতে ন্যস্ত আর সমস্ত পালেস্তাইনবাসীদের সম্পত্তি।
পরের বছরই ইংরেজরা পালেস্তাইন ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে ইংরেজরা অনেক দায়ের জালে জড়ানো অবস্থায় তাদের সৈন্যবাহিনী এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্য তার আগেই ইহুদিদের একটা জাতীয়ভূমি বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তো তারা পূর্ণ করে দিয়েছে।
এরপর জায়ানিস্টদের হাতে পালেস্তেনীয়দের নিধন শুরু হয়ে গেল।
১৯৪৮ এর এপ্রিলে দেইর ইয়াসেন, এইন এল্ জাইতোন আর সালা এল্দীনের

Scanned with ACE Scanner

কুখ্যাত গণহত্যা ঘটানো হল। একমাস পরে জায়ানিস্টরা ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল।

মানব রক্তের তর্পণে গড়া রাষ্ট্র হোল ইসরায়েল।

আর সবাইএর মত বাবাও আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ বোধ করলেন। পাশের পাহাড়গুলো থেকে হাইফার ওপর সারা দিনরাত গোলা বর্ষণ চলছিল। এন্তার গোলার বিস্ফোরণ আর মৃত্যুর গন্ধে ভারী বাতাবরণ। আমার বাবা যে কাপুরুষ ছিলেন না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। জায়ানিস্টদের সঙ্গে ব্রিটেনের গাঁটছড়া বাঁধার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে ১৯৩৬-সাল দেশে যে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, আমার বাবা তাতে যোগদান করেন। সারা দেশ জুড়ে হরতাল লাগাতার ১৭৪ দিন চলেছিল। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই দীর্ঘতম জাতীয় ধর্মঘট। ১৯৩৭ এ আমার বাবাকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তিনমাসের জন্যে কয়েদ করে।...সৈন্যরা আমাদের দোকানে তল্লাসীতে মোটর গাড়ীর ব্যাটারীর সন্ধান পেল – আর ব্যাটারী তো বিস্ফোরণের কাজে লাগতে পারে, সুতরাং তাদের যুক্তিতে আমার বাবার সঙ্গে পালেস্তেনীয় মুক্তি যোদ্ধাদের যোগাযোগ রয়েছে।...

আমাদের সব ভাইবোন সমেত আমাকেও লেবাননে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন বাবা মা। মা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। বাবা মেয়াদ শেষে ফিরে আসবেন, ফিরে আসবেন আমাদের দেশ ও সম্পদ রক্ষার সংগ্রামে। দেশের বাইরে আমাদের থাকা খাওয়ার খরচের সংস্থান করার জন্যে বাবা কিছু জমি বেচে দিলেন, ১২ই মে ১৯৪৮ আমরা লেবানন পৌঁছলুম। সেই দেশ ছাড়া, ফেরা আর হয় নি।

পালেস্তাইনে তথাকথিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল। আমি মানি, নামে কিছু যায় আসে না। তবু কি সুন্দর নাম ছিল— পালেস্তেনেইস, কি চমৎকার তাৎপর্যময় নাম। প্যালেস্তেনেইস বলতে বোঝায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহিষ্ণু বোঝা পড়া, আর তার বাসিন্দাদের সমৃদ্ধি। পালেস্তেনেইস্ বলতে বোঝায় এক মহান আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার।

তবে আবার ইসরায়েল নাম কেন তার—যে ইসরায়েল নামের অর্থই হচ্ছে জাতিবিভেদ, অন্যায় আর অবিচার। এর কোনটাই কি গৌরব করার মত গুণ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বজুড়ে নাজিদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। লেবাননের পথেও বিপদ ছিল পদে পদে। আমাদের প্রথমে বাসে, পরে গাধার পিঠে আর পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সীমান্তের মাইল দুয়েক

Scanned with ACE Scanner

আগের থেকে আমাদের বুকে হেঁটে এগুতে হল। জায়নিস্ট বন্দুকবাজরা ঠিক করেছিল দেশের ভিতর মারতে না পারলেও দেশ ছাড়ার সময় আমাদের নিকেশ করবে।

আমি জানি কিছু লোক ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়ে উৎসব করেছিল। কিসের উৎসব ছিল সেটা? দলে দলে আমাদের দেশত্যাগ দুঃখ কষ্ট আর ভগ্নহৃদয়ের দরুণ উৎসব? আমাদের মরণ আর মধ্যপ্রাচ্যে নৈতিকতার নিধনের জন্যে উৎসব?

আমার শৈশবকাল অন্য অনেকের শৈশব থেকে ছিল আলাদা—তা ছিল বিষাদের স্মৃতিতে ভরপুর।

এখানে এসে পৌঁছনোর কিছুদিনের মধ্যেই কপর্দকহীন হয়ে এক উদ্বাস্তু শিবিরে ঢুকতে হল, সেখানে প্রায় দুহাজার গৃহহীন পালেস্তেনীয় উদ্বাস্তু ছিল। ছুটির এক দিনের জন্যে কেউ যদি তাঁবুতে রাত্রি কাটায় তা মজার লাগতে পারে, স্কাউটরা উইকএণ্ডে যখন তাঁবুতে যাকে তাও খারাপ লাগার কথা নয়। তবে সারা বছর ধরে, সব সময়ে ইউ. এন. আর., ডব্লিউ. এ-এর রেশন খেয়ে ১১ জনের পরিবারকে যদি একটা ছোট্ট তাঁবুতে বাস করতে হয় সেটা বেশ অসহ্য রকমের কষ্ট।

অপুষ্টিতে মৃত সন্তানদের কবর দিয়ে ফিরতেন বাবারা, ছেলেরা ফিরত রোগভোগে লোকান্তরিত বাবাকে কবর দিয়ে। মানুষেরা যে উত্তাপ কেড়ে নিয়েছে শীতকালে একসঙ্গে গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে সেই উত্তাপ আমরা অন্য মানুষের শরীরে পাবার চেষ্টা করতুম।

ইউ. এন. আর. ডব্লিউ, এ-এর ইস্কুল। আমাদের ক্লাশে পঞ্চাশজন ছাত্র ছোট্ট ক্লাশঘর—ছাতের অজস্র ফুটো দিয়ে বৃষ্টির জলে ভিজে সপসপে হয়ে যেতুম। ভিড় কি জিনিস ভালোভাবেই শিখেছিলুম। কেউ কাঁপতে থাকলে টের পেতুম, আমরা প্রার্থনা শুরু করে দিতুম—প্রার্থনা করতুম যাতে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারি।

বাবা একে উদ্বাস্তু, তায় একজনের উপর বাকী দশজনের ভরণপোষণের গুরুদায়িত্ব। বড় কষ্টের সে সব দিন। মাসিক রেশনে মাত্র কয়েকদিন পুরো খাবার জুটত; বাকি দিনকটা আধপেটা খেতে হত। শেষ পর্যন্ত বাবা ছুতোরের একটা কাজ পেলেন। কম মাইনে তবু কিছুটা সাশ্রয় হল।

ইসরায়েল আমাদের সম্বন্ধে প্রচার করত যে আমাদের ত্রাণ সাহায্যের কোন দরকার নেই—আমাদের সাহায্য করে ইউ. এন. আর., ডব্লিউ. এ নাকি ঠকে যাচ্ছে।

Scanned with ACE Scanner

এর মধ্যেই আমি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছি। আমাদের ক্যাম্পে কোন মাধ্যমিক স্কুল ছিল না। তাই আমাকে অন্য উদ্বাস্তু শিবিরে যেতে হল।
প্রতিদিন উঠতুম ভোর পাঁচটায়।
এক কিলোমিটার হাঁটলে বাস স্টপ।
বেইরুটের শহরতলীর বাস ধরে যাওয়া।
আবার বাস বদলানো। শেষে আরও দু কিলোমিটার হেঁটে ইস্কুল। ফেরার সময়ে আবার সেই। তিন বছর ধরে প্রতিদিন এই।
আমাদের সাংসারিক বোঝা কিছুটা লাঘব করার জন্যে একটা কাজ ধরি, সেই সঙ্গে সন্ধ্যোবেলায় লেখাপড়ার ব্যাপারটাও চালিয়ে যেতে থাকি।
তিনবছরে হাইস্কুল সার্টিফিকেট পেলুম। আমি জানতুম এই খানেই আমার দৌড় শেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমার নাগালের বাইরে।
১৯৬৭ জুন। এই সময়ের আগ্রাসীযুদ্ধ আমার জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে আমার জীবন দ্বিতীয়বার মোড় ঘুরে গেল। প্রথম মোড়, আমার পরিবার এবং জনগণ যখন দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হল। ইজরায়েল আগ্রাসী আক্রমনের ফলে আবার হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসতে থাকল। আমাদের দুর্বিপাক—আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। আমাদের বয়সের ছেলেরা এবার জায়ানিস্টদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার দায়ভার কাঁধে তুলে নিল। আমার এই সমস্ত কথা, সমস্ত ভাবনা সব পালেস্তেনীয় ভাইবোনদের মনের কথা ও ভাবনারই প্রতিভূ—আমার কথা ও ভাবনা তাদের সবার ভাবনাকেই আপনার সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরবে।
আমার সামনে তখন দুটো পথ খোলা। দুটো ভিন্ন পথের ছেদবিন্দুতে আমি দাঁড়িয়ে। একটা পথ যেদিকে গেছে সে দিকে রয়েছে আমার চাকরি —এখন স্বল্প মাইনে তবে পরে সফল ভবিষ্যৎ হ'লেও হতে পারে। আমার শিক্ষকেরা বলতেন আমি প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র। কিন্তু আমি কোন রাস্তা নেব? আমার জনগনের অন্যান্য কম ভাগ্যবান ছেলেদের আশা, স্বপ্ন এবং বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের জন্যে আরামের নিরাপদ জীবন বেছে নেব? পালেস্তাইনবাসী হিসেবে মাথা উঁচু করে থাকব, আর উদ্বাস্তু যন্ত্রনায় থাকব না—আমাদের জনগনের এই দুইটি হচ্ছে একান্ত প্রিয় বাসনা। এই লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারে কেবল যদি কোনদিন আমরা নিজেদের দেশে নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে পারি।
গোল্ডা মেয়রের প্রশ্ন—"পালেস্তেনীয় কারা?"
কেন, আমরাই তো পালেস্তেনীয়।

গোল্ডামেয়ারের নিজেরই উত্তর—"পালেস্তেনীয়দের কোন অস্তিত্বই নেই।" আমরা কিন্তু ত্রিশ লক্ষ বহাল। আমরা যদি হাল ছেড়ে দিয়ে বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিই গোল্ডামেয়াররা চিরকাল আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যাবে। কেবল দাবি ন্যায়সঙ্গত হলেই ব্যাপারটা মিটে যায় না—আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় এই সত্যিটা শিখেছি। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে নৈতিক সাহসও বুকে লালন করতে হবে।

আমি বুঝে ফেলেছি—পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে ওটা কোন সমস্যাই নয়। আমি বুঝতে শিখেছি যে আমি ঐ তিরিশ লাখেরই একজন। আমাদের সামনে দুটো রাস্তা নেই। রাস্তা একটাই—এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। পালেস্তেনীয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এটাই হচ্ছে শেষ কথা—আর এই জন্যেই পালেস্তেনীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমি সামিল হয়েছি। আমাদের প্রিয় স্বদেশ পালেস্তাইনকে ফিরে পাবার জন্যেই আমাদের এই লড়াই—

পালেস্তাইনে নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্যে এ লড়াই। সে সমাজে মানুষের কোন শোষণ থাকবেনা। সেই সমাজের ভিত হিসেবে থাকবে বিভিন্ন জনগণের মধ্যে বোঝা পড়া আর সহনশীলতার নীতি।

বিজয় সরকার

Scanned with ACE Scanner

পর্বত

ওয়ালিদ রাব্‌হ

যখন দিনান্তের শেষ লাল সূর্যরশ্মিটুকু নিশীথ অন্ধকারের সাগরে ডুবে যাচ্ছে তখন সে তার সেলের ছোট্ট গর্তটাতে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে আছে প্রকৃতির অপার রহস্যময়তার দিকে। কতক্ষণ যে সে এইভাবে অপলক দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেলের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়েছিল, তার সে খেয়াল ছিল না। কিন্তু ঠিক তখুনি সে অনুভব করলো একটা ভারী পাথর ধীরে ধীরে তার বুকের উপর চেপে বসছে। আরও, আরও শক্ত হয়ে চেপে বসছে সেটা। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। উঃ—কী কষ্ট! একটু, একটু আলো চাই—একটু বাতাস।

সেলের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা তার সাথীর দিকে সে তাকালো। অঘোরে ঘুমাচ্ছে ও। সে চিন্তা করলো—এখন ওকে জাগিয়ে তার কষ্টের কথা বলে আর কী হবে?

তখনই সঙ্গীর কথা ভেসে এল অন্ধকার থেকে—

—'কী হয়েছে, ম্যাগিন?'

—'কিছু না ঘুমিয়ে পড়।' মৃদু স্বরে সে জবাব দিল।

—'ঘুমিয়েই তো ছিলাম। এত ছটফট করলে জেগে তো উঠতেই হয়।'

—'আমার বুকের উপর একটা পর্বত চেপে বসেছিল যেন।' সে বললো।

অন্ধকার এখন চুপিচুপি বেশ ঘন হয়ে আসছে। সেলের গর্তটার ভিতর দিয়ে সে আবছা অথচ জ্বলজ্বলে তারাগুলির দিকে তাকালো। তাদের নরম আর মিষ্টি আলো যেন তাকে ভালবাসতে চাইছে গভীরভাবে। এখন তার একটু আরাম বোধ হচ্ছে, ভালো লাগছে।

—আগের জেলখানাটা ছিল একটা কবরখানার মত। সেখানে না ছিল সূর্য, না ছিল বাতাস, না ছিল পৃথিবী। এখানে অন্তত নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো বিশুদ্ধ বাতাস আছে।'

—'কী তখন থেকে বকছো বলোতো?'

—'কিছু না।' সে নিজেকে ফিরে পেল।

—'কিন্তু তুমি তো পাগলামী শুরু করেছো।' সঙ্গীটি বললো।

নাল লাগানো ভারী জুতোর একঘেয়ে আওয়াজ তাদের দরজার দিকে

Scanned with ACE Scanner

এগিয়ে আসছে—দরজার কাছে এসে আওয়াজ থামলো।
—'তোমার কি খিদে পেয়েছে?'
—'বুকের ওপর চাপানো পাথরটা আমার আজকের সমস্ত খিদেকে কেড়ে নিয়েছে।'
—'বোধ হয় ওরা রাতের খাবার এনেছে। তুমি তো সারাদিন কিছু খাওনি।'
—'শুনেছ জুতোর আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে; খাবার সময় এখনও আসেনি। পাহারাদার টহল দিচ্ছে। ঐ পাহারাদারটা কিন্তু আমাদের মতই পরাধীন। নিয়মের খাঁচায় বন্দী—ওকেও সহ্য করতে হয়েছে অনেক অত্যাচার। আর দেখনা, ঐ গত শীতে আমি যখন জেলে ছিলাম—পাহারাদারটা আমাকে বার বার প্রশ্ন করেছে—আমার খিদে পেয়েছে—না তেষ্টা পেয়েছে—শীত করছে? মমতামাখা চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে থাকত। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে সে আমাকে এড়িয়ে যেত; হয়ত ভাবত আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তাকে জেলখানার দিকে ঠেলে দেবে।'
রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। তার মনে হচ্ছে গোলাগুলির আওয়াজ যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে—শিশুদের আর্ত-চিৎকার সে যেন শুনতে পাচ্ছে—সেলের এক কোণে সরে এসে দু'হাতে কান চেপে চোখ বন্ধ করে, মাথা নামিয়ে সে সব কিছু থেকে দূরে সরে যেতে চাইল।
—'এটা বাজ পড়ার আওয়াজ, তুমি এরকম করছ কেন?' সঙ্গীর কথা তাকে সচেতন করল।
ছোট্ট গর্তটার মধ্য দিয়ে তারায় ভরা আকাশটার দিকে সে চেয়ে রইল; বলল—'গত সেপ্টেম্বরে আমার মা আমার জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার ধারণাই ছিল না, আমি বেঁচে আছি। কিন্তু দশদিন পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম। আর তখন বাড়ির সামনে দশটা পচা গলা মৃত দেহ; যাদের কবর দেওয়ার কেউ ছিল না। মৃতদেহের দুর্গন্ধ তখন সমস্ত বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। কাজটা আমিই নিলাম, জ্বালানীর সাহায্যে একটা মৃতদেহ থেকে আরেকটা মৃতদেহকে পুড়িয়ে ফেললাম।'
ম্যাগিনের মন কেন যেন আজ বার বার তার পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে। সে যেন শুনতে পাচ্ছে গুলির হিস্ হিস্ শব্দ; দেখতে পাচ্ছে আরও দুজন সঙ্গী যারা তার যুদ্ধের সাথী ছিল; অনুভব করতে পারছে গুলির আচমকা আওয়াজে তার হঠাৎ পাওয়া ভয়কে।

—'তুমি এরকম অশান্ত হয়ে উঠলে কেন ?'

পরমুহূর্তেই তারা দুজনে শুনতে পেল তালা খোলার শব্দ, দরজাটা খুব আস্তে খুলে গেল। একজন সৈনিক ঠিক দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সৈনিক-টির মুখে উদ্বেগ—জড়তাপূর্ণ স্বরে সে বলল—'আমি তোমাদের কিছু কাজে লাগতে চাই—অবশ্য আমি জানি না আমি কি কাজে লাগব।' সৈনিকটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল—ওরা তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

—'তুমি কি বলতে চাইছ ?'

—'কাল তোমাদের ফাঁসী দেওয়া হবে, আমি......তোমরা যদি চাও...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে ম্যাগিন বলে ওঠে—'ধন্যবাদ, আমাদের আর কিছুই চাওয়ার নেই—আমি যে আর কোনদিন বাড়ী ফিরব না সে খবর আমি মাকে পাঠিয়েছি।'

ম্যাগিনের সঙ্গী ঠাণ্ডায় কাঁপছিল—তার দিকে তাকিয়ে সৈনিকটি বলল—'তোমার কিছু বলার আছে ?'

—'আমার কেউ নেই—গত সেপ্টেম্বরে একটা ট্যাঙ্কের নীচে তারা সবাই হারিয়ে গেছে।'

দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

ওরা ঠাণ্ডা মেঝেতে পাশাপাশি বসল।

—'আচ্ছা, বলতে পার ; ওরা আমাদের ফাঁসী দিচ্ছে কেন ?'

ম্যাগিন খুব শান্ত অথচ কঠিন স্বরে বলল—'তোমার পরিবারকে ধ্বংস করেছে যে ট্যাঙ্ক তাকে আমরা গুঁড়ো করে দিয়েছি।' ম্যাগিনের চোখগুলো জ্বলে উঠল ; দাঁতগুলো ঠোঁটের ওপর চেপে বসে রক্তের রেখা ফুটিয়ে জানিয়ে দিল তার মনের সমস্ত বিদ্বেষকে।

জুতোর আওয়াজ আবার এগিয়ে আসছে।

—'রাতের খাবার আসছে ?'

ম্যাগিন হেসে উঠল। জেলখানার জীবনে এই বোধহয় তার প্রথম হাসি।

—'কাল আমরা মারা যাব, আজকের রাতে আমাদের খাবারের কোন প্রয়োজন নেই।'

—'খালি পেটে মরার চেয়ে, ভরা পেটে মরা অনেক ভালো।'

—'তফাৎটা কোথায়।'

Scanned with ACE Scanner

লোহার দরজা সরিয়ে সৈনিকটি ভেতরে ঢুকতেই ওরা তাদের খাবারের থালাগুলো নিয়ে নিল।

—'আরে এই প্রথম আমরা একটা বিরাট মাংসের টুকরো পেলাম।'

ম্যাগিন বিদ্রূপ ভরা গলায় বলল—'এক টুকরো মাংস আজ তোমার জন্য, কাল দুটো উট তাদের জন্য।'

সে তারায় ভরা আকাশে তার চোখ দুটোকে ডুবিয়ে দিল। তার সঙ্গী তখন অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে।

—'সত্যিই ভালো খাবার; তুমি খাচ্ছ না কেন?'

—'তোমার খাবারের মধ্যে রক্ত কেন!'

—'কি বোকা তুমি, এটা তো টম্যাটোর সস্।'

ম্যাগিন আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে চেয়ে রইল কড়িকাঠের দিকে। চোখের সামনে ফাঁসিকাঠটা ভেসে উঠল।—কাল তার মৃত্যু—তাকে লাল রঙের; ঠিক রক্তের মত লাল রঙের পোষাক পরানো হবে।

—'কিন্তু পোষাকটা লাল হবে কেন?'

—'বোধ হয় রক্তটাকে ঢাকবার জন্য?'

—'কিন্তু এটাতো ফাঁসি কাঠ নয়।'

—'ওরা বলে এটাই নাকি মরার সব থেকে সহজ উপায়।' কেমন বিভ্রান্ত অথচ ভরাট গলায় ম্যাগিন বলল।

—'কি বলছ তুমি!'

—'কিছু না।'

—'তুমি বলছ ফাঁসিই মরার সব থেকে সহজ উপায়।'

—'হাঁ। তাই।'

ম্যাগিনের সঙ্গী একথা মানল না।

ম্যাগিনের মনে পড়ছে তার পুরনো দিনের কথা, ভাবছে তার পরিবারের কথা যাদের কোনদিনই আর সে দেখতে পাবে না।

সঙ্গীও বলছে তার মায়ের কথা—নিজের কথা।

—'আমার মা তার গয়না বিক্রী করে বাবাকে রাইফেল কিনে দিয়েছিলেন, কিন্তু মা মারা গেলেন একটা ট্যাঙ্কের নীচে—মা আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি শুনিনি—আমি আগুনকে ভালোবেসেছিলাম আর তাকেই সাক্ষী রেখে বন্দুককে করেছিলাম জীবনসঙ্গিনী।

মা আমাকে আরও……আরও ভালোবেসেছিলেন।

আলোটা হঠাৎ নিভে গেল।

Scanned with ACE Scanner

—'ওরা আলোটা নেভালো কেন ? এটাই তো আমাদের শেষ রাত্রি।'

—'না, বাইরের সব আলো নিভে গেছে। জেনারেটারটা খারাপ হয়ে গেল বোধহয়।'

ম্যাগিন দেখতে পাচ্ছে।

ভোরের আলো অন্ধকারকে চৌচির করে পাহাড়ের চুড়োটাকে রাঙিয়ে দিচ্ছে।

ওরা এগিয়ে আসছে, বুটের আওয়াজ যেন ঠিক বুকের ভেতরে।

তারা সেলের দরজার তালা খোলার 'ঝনাৎ' আওয়াজ শুনতে পেল। একটা দেশলাই জ্বলে উঠেছে—সৈনিকদের মুখগুলোকে চমকে দিয়ে আলোটা নিভে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যরশ্মির ছটা তাদের পৌঁছে দিল নতুন এক প্রভাতে।

অভীক দত্ত

Scanned with ACE Scanner

সহিষ্ণু দেশ সহিষ্ণু মানুষ

স্মৃতি হামদান

ঘুম ভাঙার পর আমি এক অদ্ভুত ধরনের উষ্ণ আমেজ অনুভব করলাম। মনে হল বাড়িতে কি যেন একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে। সমস্ত ঘর-খানায় যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি আমার পঞ্চইন্দ্রিয় প্রসারিত করে দিলাম। প্রসারিত করে দিয়ে কী ঘটেছে তা অনুভব করার চেষ্টা করলাম। রাস্তাতেও কেমন একটা গভীর নিস্তব্ধতা থমথম করছিল। আর সে নিস্তব্ধতা ছিল আরও অসহ্য এবং ভয়ঙ্কর। এমন ভয়ঙ্কর যে আমার মতো এতটুকুন ছেলের পক্ষেও তা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। হঠাৎ হাওয়ার ঘন পর্দা ভেদ করে একটা গমগম কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "প্রতিটি শক্ত সমর্থ তরুণকে অবশ্যই..."। এই কণ্ঠস্বরের বা আহ্বানের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আব্বা ঘরের এক কোণে অবসন্নের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোশাক পাল্টাচ্ছিলেন। আর আম্মা ছোট্ট ভাইটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে আদর করছিলেন।

কণ্ঠস্বরটি আবার ভেসে এল। আব্বা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তারপর আব্বা বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন। আমি আব্বার কামিজের একটা কোণ ধরে ঝুলে পড়লাম। আম্মা আমাকে টেনে নিয়ে বললেন,—ছেড়ে দে, তোর আব্বা এখন বাইরে যাচ্ছেন।

—এখন, এই অসময়ে কেন ?

—হাঁ, অসময়েই

—আজকে শুক্রবার না ?

—তুই বড্ড বকবক করতে পারিস !

দরজায় একটা ছোট্ট ফুটো ছিল। সেই ফুটোতে চোখ লাগিয়ে বড় রাস্তায় কি ঘটে চলেছে আমি তা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। রাস্তা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। সচরাচর রাস্তাঘাট এমন জনশূন্য দেখা যায় না। মনে হচ্ছিল যেন মরুভূমি।

বড় রাস্তার শেষ প্রান্তে যে স্কুল, সেই স্কুলের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য মহিলা আতঙ্কে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বন-বেড়ালের মতো একলাফে প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলাম। চড়তেই আতঙ্কে শিউরে উঠলাম।

Scanned with ACE Scanner

স্কুল কমপাউণ্ডে অসংখ্য মানুষের ভীড় গিজগিজ করছে। শহরের বাসিন্দা এবং রিফিউজি ক্যাম্পের গাদা গাদা মানুষের ভীড় যেন এই ছোট্ট জায়গাটার মধ্যে পিষে ক্রীমকেকারের মতো চিপটে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। মাথাটা সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকিয়ে কি ঘটে চলেছে, তা আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।

বালির বস্তাগুলোর পেছনে সার সার মানুষের মাথাগুলো বেশ সযত্নে লুকোনো। মাথাগুলো একবার নড়ে উঠলো। হঠাৎ আম্মা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,—খুদে শয়তান কোথাকার, নেমে আয় বলছি, নেমে আয়। ক্ষণিকের জন্যে আমি কেঁপে উঠলাম।

প্রাচীরের ওপর থেকে আমি নেমে আসতেই আম্মা আমার চুলের মুঠি ধরে চীৎকার করতে লাগলেন,—বাঁদর কোথাকার, তুই কি ওদের মতো মরতে চাস?

ধাক্কা দিতে দিতে আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিলেন। স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে আমি কিছুক্ষণ নিথরের মতো পড়ে রইলাম। আমাকে যে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরে আমাদের বাড়ির কাঠের পুরনো আসবাবপত্র থাকত। আমি সারা ঘরটা একবার আলতোভাবে চোখ বোলালাম। তারপর বেশ একটু কসরত করে উঠে বসলাম। উঠে বসার সময় পারাফিনের একটা স্টোভে আমার পা খুব জোর ধাক্কা খেল। ব্যথায় আমি চেঁচিয়ে উঠলাম,—উঃ আম্মা গো, তুমি কি আমার চীৎকার শুনতে পাচ্ছো না?

—এমন করে তুই চিল্লাচ্ছিস কেন?

—দরজা খুলে দাও, বাইরে আসব।

—যদি তোকে খুলে না দিই?

—তবে আগুনে পুড়ে মরব।

জানি না, হঠাৎ এই কথাটা আমি কেন বলে ফেলেছিলাম। এই একটি শব্দই যেন আমার সামনে আলোর মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। আর সেই একই শব্দ যেন আম্মার ওপর বিদ্যুতের মতো কসাঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে তালা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। ছুটে আমি ঘর থেকে বেরুতে গেলাম, কিন্তু আম্মা আমাকে খপাৎ করে ধরে ফেললেন। ধরে আমাকে এক অদ্ভুত মমতা-মাখানো কণ্ঠে বললেন,—খোকা, আল্লা তোর রহম করুক, কক্ষনো বাইরে যাস না।

আম্মাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—না আম্মা, আমি আর বাড়ির বাইরে যাব না। শুধু দরজার ফুটো দিয়ে বাইরে দেখব।

দরজার ফুটোতে আবার চোখ লাগলাম। দেখলাম, বহু ছেলে রাস্তায় ছুটোছুটি করছে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই জলের পাত্র। তাদের হাতে জলের পাত্র দেখে মনে হল আমার আব্বাও যেন তেষ্টায় ছটফট করছেন। আমি ঘরে ঢুকে জলের পাত্র খুঁজতে লাগলাম। একটা পুরানো চীনেমাটির পাত্র দেখতে পেয়ে পাত্রটিতে জল ভরে সবে দরজার খিলে হাত রেখেছি, আম্মা আমাকে আবার খপ করে ধরে ফেললেন, —খুদে শয়তান কোথাকার, জল নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ?

বললাম,—একবার বাইরে দেখ, প্রতিটি ছেলেই জল নিয়ে চলেছে। আমাকে যেতে দাও, আমি যাব।

অনেক কষ্টে ধস্তাধস্তি করে আম্মা আমার হাত থেকে চীনে মাটির জগটা কেড়ে নিলেন। কেড়ে নিয়ে বললেন, —তুই কি আজ মরতে চাস ?

—না, আমি মরতে চাই না।

—তবে বাইরে বেরুস না।

—ছেলেরা কি সব রাস্তায় মরতে গিয়েছে ?

আম্মার কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়ার আগেই রাস্তায় বন্দুক গর্জে উঠল। আমি দৌড়ে দরজার ফুটোতে চোখ লাগালাম। দেখলাম, ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ার্ত খরগোশের মতো যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। বন্দুকের গর্জন আর ছেলেদের ভয়ার্ত ছোটাছুটি দেখতে দেখতে সময় কোনদিক দিয়ে যেন মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়ল। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আবার ফিরে এল। ফিরে এসে স্কুলের প্রাচীরের দিকে পায়ে পায়ে এগুতে লাগল। চারদিকে একবার আমি চোখ বুলিয়ে নিলাম, কোথাও আম্মা আছেন কিনা। এক ঝটকায় জগটা তুলে নিয়ে ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। মুহূর্তের মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে জুটে স্কুলের প্রাচীরের দিকে খুব সন্তর্পণে এগুতে লাগলাম। স্তূপাকার বালির বস্তার ওপর দিয়ে শুধু মানুষের সারবদ্ধ মাথাগুলো দেখা যাচ্ছিল। কনুইয়ে সমস্ত শরীরের ভর রেখে মানুষ-গুলো উদগ্রীব চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। মানুষগুলোর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে চললাম, কোথাও আব্বা আছেন কিনা। আমাদের প্রত্যেকের হাতের চীনে মাটির পাত্রগুলো যেন এক অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একটা লোক বালির বস্তার ওপর মাথা তুলে তার চারদিকে নিমেষে চোখ বুলিয়ে নিল। তার এই চোখ বোলানোর অর্থ কি, তা আমরা নিমেষে বুঝে নিলাম। অর্থাৎ সে জল চাইছে। আমরা সবাই ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। স্কুলের প্রাচীর থেকে মানুষগুলোর যে সারি, সেই সারির দূরত্ব কতখানি আন্দাজ

করার চেষ্টা করলাম। নিশানা বাগিয়ে সৈনিকরা রাস্তার এমুখ থেকে ওমুখ টহল দিচ্ছে। টহল দিতে দিতে ফিরে আসার আগেই আমি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই দূরত্বটা পার হতে পারব কিনা আন্দাজ করে নিলাম।

এক লাফে প্রাচীর টপকিয়ে আমি হাওয়ার বেগে সারিবদ্ধ মানুষগুলোর দিকে ছুটে গেলাম। অনুভব করলাম আমার খুদে সাথীরাও আমার পেছন-পেছন ছুটে আসছে।

তৃষ্ণার্ত লোকটির হাতে জলের পাত্রটি ধরিয়ে দিয়েই আমি আবার হাওয়ায় পাখির মতো ডানা মেলে যেন উড়ে এলাম।

প্রাচীরে লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলি শোঁ শোঁ করে ছুটে এল। একটা গুলি আমার মাথার পাশ দিয়ে হিস হিস করে বেরিয়ে গেল। আমি প্রাচীরের ওপর থেকে ধপাস করে পাথরের মতো গড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজের সম্বিত ফিরিয়ে এনে ডান হাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম আমার ডান হাতে এতটুকুও শক্তি নেই। তাই বাঁ-হাতের ওপর ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। একটা বালির বস্তার ওপর ধপাস করে পড়ে গেলাম। কাঁধের উপর আগুনেপুড়ে-যাওয়ার মতো একটা প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। সমস্ত হাত রক্তে ভেসে গিয়েছিল। ব্যাথায় আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। কেমন একটা অবসাদ, ঘুম-ঘুম আমেজ আমাকে জড়িয়ে ধরছিল। চারদিকের চরাচর যেন আমার চোখের সামনে নাচতে লাগল।

কোন রকমে চোখ টানটান রেখে আমি মসৃণ পাথর আর সাদা ধবধবে দানবগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। কেমন একটা পাগলমন যেন আমার ওপর সওয়ার হয়েছিল। সমস্ত মাথা পাথরের মতো প্রচণ্ড ভারী হয়ে উঠেছিল। পেটে কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করলাম। চোখ বুঁজে কী ঘটেছিল তা মনে করার চেষ্টা করলাম। তারপর হঠাৎই বুকফাটা চীৎকার করে উঠলাম, —আব্বা গো তুমি কোথায় ?

এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আবিষ্কার করলাম আমি আমার জীবনের সবচেয়ে অমূল্য জিনিসগুলো হারিয়েছি। যা আর কোনদিনই আমি ফিরে পাব না।

এই অমূল্য জিনিসগুলোর মধ্যে আছে আমার আব্বা, আমার হাত আর আমার ছেলেবেলার দিনগুলি।

কমলেশ সেন

Scanned with ACE Scanner

আর এক বিদ্রোহী

হাকাম বালাউই

বাসটা গ্রামের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছিল। যাত্রীদের একজন পিছনের সীটে একা বসে ভাবছিল বিরাট সেইসব ঘটনাগুলোর কথা যেগুলোর সঙ্গে সে নিজেও জড়িত ছিল। একটা গভীর তৃপ্তির অনুভূতি তাকে অভিভূত করে রেখেছিল। যতবারই সে চিন্তা করছিল, তাদের আজকের এই যাত্রার উদ্দেশ্যের কথা, তার সঙ্গী-সাথীদের কথা এবং যে-ইতিহাস তারা রচনা করতে চলেছে সেকথা, ততবারই তার মনে হচ্ছিল সে একজন কেউ-কেটা নয়।

বাসটা পাহাড়গুলোর গা ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছিল। জায়গাগুলো সব তার পরিচিত হলেও সেগুলোর প্রতি তার কোনও আকর্ষণ ছিল না। একটা দুর্নিবার শক্তি তাকে টানছিল নদীর পশ্চিম তীরের দিকে, মনে হচ্ছিল সৃষ্টির দিনটি থেকে তার নিয়তি সেখানেই তার অপেক্ষায় রয়েছে।

সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে সে হাসল। অন্ধকার বাসে কেউ তার হাসি দেখতে পাবে না। তার গোপন চিন্তা ধরে ফেলতে পারবে না জেনে সে উপভোগ করছিল এই শিশুসুলভ আনন্দ। অথচ এই একই চিন্তা বাসের সব যাত্রীর মনেই ঘুরছিল। কারণ, অপরিহার্য-ভাবেই তাদের প্রত্যেকের চিন্তার শেষ ধুয়া ছিল: আমার পালেস্তাইন! আমার দেশ!

অধিকৃত অঞ্চল সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবোধের জন্যে যখন তার সঙ্গীরা তাকেই অধিনায়ক নির্বাচন করেছিল তখন তার মনে হয়েছিল তার জীবনে এর চেয়ে অধিকতর গর্বের ও সম্মানের মুহূর্ত আগে কখনও আসেনি। তখনই অন্ধকারে সে অনুভব করল তাঁর কাঁধের ওপরে রাখা এক-খানা হাত—যেন তার চেতনমনে বয়ে আনছে তার সঙ্গীদের গভীর আস্থা ও উষ্ণতা।

আবার তখনই সে শুনতে পেল অন্যান্য যাত্রীরা হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছে, যেন একদল হাইস্কুলের ছেলে পিকনিক করতে চলেছে। সেই হাসির মধ্যে সে দেখতে পেল এই তরুণদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও আত্মবলির মূর্তরূপ।

এদের হাসিঠাট্টায় এক বৈসাদৃশ্যের ছবি ফুটে উঠল তার সামনে। তার মনে পড়ে গেল প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগের দিনগুলোতে তার

Scanned with ACE Scanner

নিজের ফ্ল্যাটের অর্থহীন আনন্দোচ্ছ্বাসের কথা, যা শুনতেই সে অভ্যস্ত ছিল। ঐসব দিনগুলো তার কেটেছিল হৈ-হুল্লোড় করে, প্রায়ই এমন সব মানুষদের সঙ্গে যাদের জীবনে ক্ষণিকের সুখভোগ ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। আবার তখনই তার মনে ভেসে ওঠে তার বাবার চেহারাটা, যিনি হালে আশি বছর বয়সে মারা গেছেন। তার এখনও মনে পড়ে বাবার সেই ছোট-ছোট গর্তে-ঢোকা চোখদুটোর সঙ্কল্পদীপ্ত দৃষ্টি, যা ছিল কবরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর সাথী। তাঁর অন্তর্ভেদী ও প্রতিজ্ঞাদৃঢ় চাউনি তাঁর মনে আশা জাগিয়ে রাখতে যে, কোন একদিন তিনি স্বদেশে ফিরবেনই।

মৃত্যু যখন আসন্ন তখন তিনি বলেছিলেন, তাঁকে সমাধিস্থ করার সময়ে তাঁর মুখটা যেন পশ্চিমদিকে, পিতৃপুরুষদের বাসভূমির দিকে ফেরানো থাকে। মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেমেয়েরা একটুকরো কাগজ পেয়েছিল তাঁর পুরনো ডেস্কের ওপর যাতে লেখা কথাগুলো তাদের জীবনে নীতিবাক্য হয়ে আছে: এই পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যও কোন মানুষের নিজ দেশে মুক্ত জীবনযাপন ও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ রূপে গণ্য হতে পারে না। জনগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া ভূমি রক্তের বিনিময়ে পুনরুদ্ধার করা।

তার বাবার মত মানুষেরাই তাকে ও আরো অনেক তরুণকে উৎসাহিত করেছে প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দিতে এবং নিজের মাতৃভূমিতে স্বাধীনভাবে মৃত্যুবরণ করবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে। অনেক তরুণই নদীর পশ্চিম পারে গিয়েছিল, অনেকেই তাদের মধ্যে আর ফেরেনি। তবে, সবসময়েই নতুনরা এসে তাদের জায়গা নিয়েছে, শপথ করেছে, পিতৃভূমিকে মুক্ত করার। আর যারা কোনদিনই ফিরবে না, তাদের জন্যে চোখের জল ফেলা হয়নি, কোনরকম শোক করা হয়নি, উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দনও করেনি কেউ। একমাত্র তাদের ছবির উপরে লিখে রাখা হয়েছিল তাদের নাম। রাস্তার দেওয়ালগুলো অলংকৃত করা হয়েছিল এইসব বীর সন্তানদের পরিচয়সহ ছবি দিয়ে।

হঠাৎ তার কানে এল সঙ্গীদের একজন তাকে বলছে যে নির্ধারিত স্থানে তারা পৌঁছে গেছে। সে এতই চুপচাপ ছিল যে ওরা ভেবেছিল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার খুব ইচ্ছা হয়েছিল ওদের বলতে যে সে ঘুমোয়নি, আর সেই-সঙ্গে তার মনের টাটকা চিন্তাভাবনাগুলোকে ওদের জানাতে। কিন্তু তখনই আবার তার মনে হয়েছিল যে ওরাও হয় তো ঐ একই কথা চিন্তা করছে। তাছাড়া, সে আরো ভেবেছিল যে এসব অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার সময় কোথায় এখন; বন্দুকের গুলিই যখন আরো বেশী সোচ্চার করে তুলবে তার অনুভূতিগুলোকে।

Scanned with ACE Scanner

নিজের ফ্ল্যাটের অর্থহীন আনন্দোচ্ছ্বাসের কথা, যা শুনতেই সে অভ্যস্ত ছিল। ঐসব দিনগুলো তার কেটেছিল হৈ-হুল্লোড় করে, প্রায়ই এমন সব মানুষদের সঙ্গে যাদের জীবনে ক্ষনিকের সুখভোগ ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। আবার তখনই তার মনে ভেসে ওঠে তার বাবার চেহারাটা, যিনি হালে আশি বছর বয়সে মারা গেছেন। তার এখনও মনে পড়ে বাবার সেই ছোট-ছোট গর্তে-ঢোকা চোখদুটোর সঙ্কল্পদীপ্ত দৃষ্টি, যা ছিল কবরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর সাথী। তাঁর অন্তর্ভেদী ও প্রতিজ্ঞাদৃঢ় চাউনি তাঁর মনে আশা জাগিয়ে রাখতে যে, কোন একদিন তিনি স্বদেশে ফিরবেনই।

মৃত্যু যখন আসন্ন তখন তিনি বলেছিলেন, তাঁকে সমাধিস্থ করার সময়ে তাঁর মুখটা যেন পশ্চিমদিকে, পিতৃপুরুষদের বাসভূমির দিকে ফেরানো থাকে। মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেমেয়েরা একটুকরো কাগজ পেয়েছিল তাঁর পুরনো ডেস্কের ওপর যাতে লেখা কথাগুলো তাদের জীবনে নীতিবাক্য হয়ে আছেঃ এই পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যও কোন মানুষের নিজ দেশে মুক্ত জীবনযাপন ও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ রূপে গণ্য হতে পারে না। জনগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া ভূমি রক্তের বিনিময়ে পুনরুদ্ধার করা।

তার বাবার মত মানুষেরাই তাকে ও আরো অনেক তরুণকে উৎসাহিত করেছে প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দিতে এবং নিজের মাতৃভূমিতে স্বাধীনভাবে মৃত্যুবরণ করবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে। অনেক তরুণই নদীর পশ্চিম পারে গিয়েছিল, অনেকেই তাদের মধ্যে আর ফেরেনি। তবে, সবসময়েই নতুনরা এসে তাদের জায়গা নিয়েছে, শপথ করেছে, পিতৃভূমিকে মুক্ত করার। আর যারা কোনদিনই ফিরবে না, তাদের জন্যে চোখের জল ফেলা হয়নি, কোনরকম শোক করা হয়নি, উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দনও করেনি কেউ। একমাত্র তাদের ছবির উপরে লিখে রাখা হয়েছিল তাদের নাম। রাস্তার দেওয়ালগুলো অলংকৃত করা হয়েছিল এইসব বীর সন্তানদের পরিচয়সহ ছবি দিয়ে।

হঠাৎ তার কানে এল সঙ্গীদের একজন তাকে বলছে যে নির্ধারিত স্থানে তারা পৌঁছে গেছে। সে এতই চুপচাপ ছিল যে ওরা ভেবেছিল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার খুব ইচ্ছা হয়েছিল ওদের বলতে যে সে ঘুমোয়নি, আর সেই-সঙ্গে তার মনের টাটকা চিন্তাভাবনাগুলোকে ওদের জানাতে। কিন্তু তখনই আবার তার মনে হয়েছিল যে ওরাও হয় তো ঐ একই কথা চিন্তা করছে। তাছাড়া, সে আরো ভেবেছিল যে এসব অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার সময় কোথায় এখন, বন্দুকের গুলিই যখন আরো বেশী সোচ্চার করে তুলবে তার অনুভূতিগুলোকে।

আস্তে-আস্তে তারা নদীর দিকে নামতে শুরু করল লাগল। কিন্তু সেই চন্দ্রহীন রাতের ঘন অন্ধকারে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ঐ অঞ্চলের নীরবতার জাল ছিঁড়ে খান-খান করছিল। নদীর গভীর জল রাজকীয় মহিমায় জানাচ্ছিল তাদের সাদর অভ্যর্থনা। নদীটা যেন একটা বুদ্ধিমতী চেতনসত্তা --সে জানে কারা তারা, আর কি উদ্দেশ্যেই বা তারা নদী পারাপার করছে। তারাও নদীটাকে তাদের বন্ধু ও সাথী বলে ধরে নিয়েছিল; এমনকি, তার একটা ডাকনামও দিয়েছিল, যেমন তারা পরস্পরকে দিয়েছে। আর তাদের দেশ যেন পরিত্যক্তা প্রেমিকার মত, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তার প্রেমিককে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে তারা হেঁটে যাচ্ছিল দৃঢ় পদক্ষেপে। তাদের মনের মধ্যে জ্বলছিল ক্রোধের আগুন আর উৎপীড়নকারী অনধিকার-প্রবেশিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার দুর্মর বাসনা।

মানুষগুলো হেঁটেই চলল, দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক ধরে এবং একটা বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করে: (স্বদেশে স্বাধীন জীবন ও মৃত্যুর তুলনীয় জগতে কিছুই নেই।) পৃথিবীতে আর সব কিছুই তাদের কাছে এখন মূল্যহীন, জীবনের প্রতি কোন মায়া-মমতা ছিল না, সামান্য যা-কিছু তারা পিছনে ফেলে এসেছে, সে-সবের প্রতিও তাদের ছিল না কোন আসক্তি। এক সুমধুর সম্ভাবনার স্বপ্নে তাদের মন রইল ভরে—তাদের মা ভগিনী বা স্ত্রী যুগপৎ আনন্দে ও বেদনায় চিৎকার করে কেঁদে উঠবে যখন তারা পর দিন দেখবে রাস্তার দেওয়ালের নতুন নতুন যোদ্ধাদের ছবি ও পরিচয়।

শান্তি আচার্য

Scanned with ACE Scanner

বন্দুক

নওয়াফ আবু আলহাগা

সে যখন তার হলদে রঙের ধারাল দাঁতগুলো বার করল সেকিনার গলা আশ্চর্য রকম ভাবে রুদ্ধ হয়ে এল।

চারদিকে ছড়ানো বাজারটার চারপাশ থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছে। মেয়েটি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, তার নজর গিয়ে পড়ল কাছাকাছি রাখা একটা মুরগীর ঝুড়িতে।

ঝুড়ির ভেতর একটা জোয়ান মোরগ এক জন স্থূলকায় লোকের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কর্কশ চিৎকার করছে।

মোটাসোটা লোকটা এক হাতে একটা বড় ছুরি, অন্য হাতে মোরগটার গলা ধরে দেখাচ্ছিল, জামাকাপড় নোংরা হয়ে যাবার ভয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক সুবেশ ভদ্রলোককে।

মেয়েটি কয়েক পা এগিয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু ভয় পেয়ে সে পেছিয়ে এল। তার কানে গেল ষাট বছরের এক বুড়োর গলা :

'দিনকাল কেমন বদলে গেছে!'

সত্যি, দিনকাল বদলে গেছে।

কিন্তু সাদ এখনও ফিরে আসেনি।

সে এসেছিল তাকে বিদায় জানাতে।

আমি বাজারটা পার হতে যাচ্ছিলাম।

আর সেখানে...সেখানেই সাপের বিষদাঁতের মতো ক্ষুরধার মৃত্যুর বিভীষিকা চোখে পড়ল।

মেয়েটি নিঃশব্দপায়ে লোকটাকে অতিক্রম করল,

কিন্তু সে এসে দাঁড়াল মেয়েটার সামনে।

একবার তার মনে হল লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'দূরে সরে যাও, জানোয়ার কোথাকার!'

মেয়েটি উদ্ধতভাবে তার চিবুক উঁচু করে পেছন দিকে সরতে শুরু করল। পেছনে পা ফেলার সময় এক যুবকের কাঁধে সে একটু ধাক্কা দিলে যুবকটি লজ্জায় লাল হয়ে বোকার মতো বলল :

'আমি দুঃখিত।'

Scanned with ACE Scanner

মেয়েটি আর একবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেই গালফোলা লোকটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তার মনে হল তার ওপর যেন বলাৎকার করা হয়েছে।

এবং সকলে তার দিকে আঙ্গুল তুলে বলছে—ব্যাভিচারিণী।

সাদ চলে যেতে চেয়েছিল।

জানো সাদ, যতক্ষণ আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি তার মধ্যেই অবরোধ ভেঙে পড়বে।

অপেক্ষা করা হচ্ছে একটা পিছল শিলাখণ্ডের ওপর আরেকটা পিছল শিলাখণ্ড রাখার মত—

তাহলে আমাকে কি আবার বাজার পর্য্যন্ত ফিরতে হবে?

একটা গালফোলা লোকটাকে আবার দেখা গেল; সে চিৎকার করে ছোট্ট ছেলেকে নির্দেশ দিচ্ছে:

'এই ছেলেটা, দোকানে ঢোক।'

আর একবার সে মেয়েটির গতিরোধ করল:

'ন্যায্যদামে আমার কাছে নতুন বন্দুক পাওয়া যায়।'

রোষদৃষ্টিতে মেয়েটি তাকাল তার দিকে:

'নতুন বন্দুকের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?'

'সাদ......'

'কি হয়েছে তার?'

'তার মতো এক বীর যোদ্ধা একটা পুরানো মরচে পড়া রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করছে। পুরনো বন্দুকই তাকে খতম করবে।'

সাদ, জানি না কেমন করে আমার মুখে কথা এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে চাবুকের মতো কশাঘাত করেছিলাম।

সে দাঁত বার করে হাসল।

মেয়েটার মনে হল যেন তার মাংসাশী মুখ যেন তাকে গিলে ফেলে ক্ষুধা মেটাতে চায়।

—আমার কাছ থেকে সরে যাও।

বন্দুক বা রাইফেল যুদ্ধ করে না।

যুদ্ধ করে সাদ, বুঝলে?

সেই শয়তানের মতো অপবিত্র লোকটা হাসতে শুরু করল,

হাসতে গিয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে এল তার, সে বলে উঠল:

—ওরা তাকে খতম করতে চায়।

Scanned with ACE Scanner

—ওরা? ওরা কারা?

সে তার ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলিকে আবার বার করল, মনে হল তার দাঁতের ধারাল অগ্রভাগ যেন রক্তমাখা :

—যারা তাকে মরচে-ধরা রাইফেলের মতো ব্যবহার করছে।

সাদ, আমার বাবা এই বন্দুকটা নিয়ে লড়েছেন, তখনও এটাতে মরচে পড়েনি। বাবাকে সমাহিত করার পর আমি আশ্রয় পেলাম আমার কাকার কাছে। তিনিও খুব ভালবাসতেন বন্দুক রাইফেল, তাই ওরা তাঁকেও খতম করল। সাদ, এই পুরোনো রাইফেলটার মধ্যে এখনও কিছুটা প্রাণশক্তি আছে। যখন আমাদের আলমারি ছিল, আমার নিজেরই একটা আলমারিতে এটা রেখে দিয়েছিলাম। আলমারিগুলো হারাবার পর ওটাকে রাখতাম আমার কাপড়ের মধ্যে।

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে এই রাইফেলটা যেন আমার মাংস ঝলসে খেয়েছে। এতগুলো বছর পার হয়ে যাবার পর এটাকে এখন আমি তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

সেকিনা, বাজারটা হচ্ছে একটা কর্দমাক্ত পতিত জমি।
এটা দাঁড়িয়ে আছে একটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে,
যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।
পৃথিবীটা হচ্ছে বেপরোয়া এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন,
একটা কম্পমান দেয়ালের বুকের মধ্যে এখানে
দুঃখ গাদা-গাদি করে জমে আছে।

এক স্পষ্টতার মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিলাম রাইফেলটা আর পুরোনো নয় সেটাকে দেখতেই কেবল অমন। তুমি মৃত্যুকে হাতে তুলে নিলে সাদ, আর তোমার উদ্দাম যৌবনের তীব্রতা নিয়ে সেটিকে তাদের মুখের ওপর নাচাতে লাগলে।

আকাশ মেঘে ঢাকা।

জনতা বাজারের কর্দমাক্ত রক্তমাখা জমি আর মস্ত হাঁ-করা ফাটল পার হতে পারল না।

মাংসবিক্রেতা সেকিনার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করল।

তার মনে হল একটা ইস্পাতের ছোরা তার বুক থেকে হৃদয়টাকে বার করে নিচ্ছে।

Scanned with ACE Scanner

একঘেয়ে জীবন আজ মৃত।
বিচিত্র বর্ণের সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারী করা সেকিনার পোশাক আজ মৃদুমন্দ বাতাসকেও আর আটকাতে পারে না।
সাদ, অন্ধকার রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো ক্লান্ত ও দুর্বহ মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে এসেছি। এখন এক অবহেলিত কক্ষে আমি একা।
এই জীবন আর সহ্য করতে পারছি না, সাদ।
তুমি ধীরপায়ে এসেছিলে আমার কাছে, মুখে ছিল রাঙানো স্মিত হাসি।
—সেকিনা, আলাদা পৃথিবীতে তোমার আমার যাত্রা করার এই হল উপযুক্ত সময়।
—পৃথিবীর মাটি রক্তে ভেজা, অন্ধকার।
মৃত্যু আর বিচ্ছেদ এর প্রতি পদে পদে।
যদি তুমি ডানদিকে পদক্ষেপ করো এবং আমি বামদিকে,
তাহলে আমরা কখনও একসঙ্গে মিলতে পারব না।
—তাহলেও আমরা অপেক্ষা করব।
আর অপেক্ষা করার অর্থ হল একটা পিছল শিলাখণ্ডের ওপর আর একটা পিছল শিলাখণ্ড রাখার মত।
বাইরে ঝোড়ো আবহাওয়া চলছে এবং দেয়ালটা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।
—পৃথিবী বিশাল, কিন্তু বড় অন্ধকার।
আবেগভরে সে চিৎকার করে উঠল :
—তাহলে আমরা কালো অন্ধকার পৃথিবীতেই মিলিত হবো।
ভেবে দেখ, সুদক্ষ হাত এবং পরিণত মাথায় তৈরী যন্ত্রকে যদি তুমি স্পর্শ করো তবে সারা পৃথিবীকেই মুহূর্তের মধ্যে আলোর বন্যায় ভরিয়ে তুলতে পারবে।
—সাদ, অপেক্ষমান এই মুহূর্তগুলো ধন্যবাদহীন বৎসরের মতো দীর্ঘ।
কঠিন ঠাণ্ডা বাতাস পাতলা এমব্রয়ডারী করা পোশাক ভেদ করে সেকিনার কুমারী দেহের মাংস ও হাড়কে ছুরিকাবিদ্ধ করতে লাগল।
—দূরত্ব হল বিশাল……
—তা সত্ত্বেও, সেকিনা, যে কোন কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসতে পারে।
একটা পরিচিত সন্দেহ তাকে ঘিরে ধরতেই মেয়েটি কাঁপতে শুরু করল।
বন্দুকে এত মরচে ধরেছে যে তেল দিয়েও পরিষ্কার করা যাবে না।
কিন্তু খণ্ডিত রাত্রিগুলো মরচে ধরা হলেও সাদ বন্দুক নিয়ে এগিয়ে যাবে।

Scanned with ACE Scanner

পুরোনো ধনুক এবং ভাঙা তীর নিয়েই মৃত্যুকে সে আঘাত হানতে উদ্যত। অন্ধকারে অবয়ব এবং কণ্ঠস্বর ওঁৎ পেতে আছে, চোখে তাদের সব কিছু হারাবার ভয়। জামিলা আমাকে বলল :

—সাদকে হারানো তোমার কাছে মৃত্যুর সমান।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম :

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।

ঠিক সেই সময়ে তুমি ঘরে ঢুকেছিলে।

—সেকিনা, আমরা কি চিরদিনই দুই দেয়ালের মাঝখানে থেকে যাব, যে দেয়ালটা যে কোন মুহূর্তে ধসে যেতে পারে?

যে ছুরি আমাদের অতি ধীরে ধীরে হত্যা করে তার ভয়েই কি আমাদের চিরদিন বেঁচে থাকতে হবে?

শান্তভাবে আমি উত্তর দিয়েছিলাম :

—একটা পাশবিক আকস্মিক মৃত্যুর চেয়ে অপেক্ষমান মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং তার অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়া হাজারগুণে ভাল।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জামিলার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল :

—ভাগ্যকে প্রলুব্ধ কোরো না। তুমি যৌবনের ঔদ্ধত্য নিয়ে কথা বলছ।

—এমনভাবে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার বিপদ হচ্ছে—আমাদের সহস্রবার মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।

যারা জীবনের উদ্দামতার মধ্যে মৃত্যুর কথা ভুলে যায়,
অনেক ভাবী পরিকল্পনা নিহিত থাকে অনাগতর মধ্যে,
তাদের কাছেই মৃত্যু দেখা দেয় কঠিনতররূপে।

—আমরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারি না।

জামিলা বিস্মিত হয়ে বলল : তাহলে……

আমি বললাম : তাকে নিজের হাতে তৈরী করে নিলে ভাল হয় না?

অনিশ্চয়তা সময়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যেন অপেক্ষা করা হচ্ছে একটা পিছল শিলাখণ্ডের ওপর আর একটা পিছল শিলাখণ্ড রেখে।

কসাই-এর হাতে মোরগটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

ষাট বছরের এক বুড়ো বিলাপ করে করে উঠলেন :

—দিনগুলো কেমন বদলে গেছে! এই ছেলেটা, গাধাটাকে যেতে দে।

—কি আশ্চর্য……

এপ্রিল মাসের কাছাকাছি আমার বাবা মারা গেলেন।
তারা যখন বিদেশী মাটিতে তাঁর পিছনে পিছনে চলেছিল,
তখন বৃষ্টি পড়ছে।
তাদের সিক্ত মুখ এবং সজল চোখ বৃষ্টি অথবা অশ্রুধারায় ভিজে উঠেছিল কিনা তা বলতে পারবো না।
আমার মনে হল দোলায়মান শবাধারের অনুসরণকারী যাত্রীরা তাদের নিষ্ফল অশ্রুকে গোপন করতে পেরে বৃষ্টির কাছে কৃতজ্ঞ।
কেবলমাত্র আমিই বৃষ্টির জল এবং অশ্রুর মধ্যে পার্থক্য অনুভব করতে পারছিলাম।
সেই জল আমার অধরে গড়িয়ে পড়লে,
জিভ দিয়ে তার নোনা স্বাদ পেলাম।
চোখের জল লবণাক্ত এবং উষ্ণ অথচ বৃষ্টির জল মিষ্টি এবং টাটকা।
এই জীবনে আর কখনো কারো জন্যে আমি কাঁদতে চাই না।
বাজারে মুহূর্তের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।
—সাদ কি নিহত ?
লোকটার গালফোলা আরও স্ফীত হয়ে উঠল, তার গণ্ডে কালো রক্তের আভা।
—তোমরা কি বিশ্বাস করবে সে একটা পুরোনো বন্দুক নিয়েছিল ; ভেবেছিল এই নিয়ে মিরাজ বিমানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?
বুড়ো শেখ কেঁদে উঠলেন।
—কিভাবে দিনগুলো বদলে গেছে !
হতভাগ্য সাদ, এবার আমরাও মরতে যাচ্ছি।
যদি আমি তোমার বদলে মৃত্যু বরণ করতাম……
স্তূপীকৃত তরমুজের কাছাকাছি আসতেই গাধাটা দুলতে সুরু করল।

—ফেডিনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যই সাদ ইউনিভারসিটি ছেড়ে এসেছিল।
বন্দুক-ব্যবসায়ীর হাসি খন্ খন্ করে বেজে উঠল।
সাহস ভরে সে আমার দিয়ে তাকাতেই আমি লজ্জিত হলাম।
এই জাতীয় অপরাধে আমি নিষ্পাপ,
পৃথিবীর চোখে আমার সর্বাঙ্গে লজ্জার আবরণ ;
কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে অভিযোগ।
—তুমি একটা ব্যাভিচারিণী।

Scanned with ACE Scanner

—আমি ধর্ষিতা।
তারা আমাকে জোর করে বেঁধে ফেলে প্রাণের ভয় দেখায়।
আমি বাধা দিলাম,
তারা আমাকে প্রহার করল।
তাদের মুখে থুতু দিলাম,
তাদের কয়েকজনকে আহত করলাম,
কিন্তু তারা আমাকে মারল।
আমি জ্ঞান হারালাম।
জ্ঞান ফিরলে প্রথমেই আমার নজরে পড়ল মাটির ওপর, আমার কাপড়ে আর উরুতে রক্তের দাগ। ওরা হাসল ঃ
—ব্যভিচারিণী।
সাদ, এইভাবে আমাদের নিয়ে ওদের মজা করতে করতে দিতে চাও কেন? তুমি কেন একটা পুরোনো রাইফেল নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করলে? আমি কাঁদছি, আমাদের পাশের দেয়ালগুলো যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে। ধ্বংসস্তূপ ছাড়া তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তার সঙ্গে একটা সাধারণ মুখোমুখি সাক্ষাতের ইচ্ছা মেয়েটিকে পেয়ে বসল। কোনরকম নিয়ম বাঁধা কাজে তার মন বসে না। আগে যদি সে ঘণ্টাখানেক বসে সেলাই করতো, মনে হতো তার জীবন থেকে বুঝি একটা বছর পার হয়ে গেছে।
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে আবার বাজারের পথে এল।
বোমারু বিমানে আকাশ যখন ছেয়ে গেল তার মনে হল এবার বোধহয় একঘেয়েমির পালা শেষ হতে চলেছে।
সে তাড়াতাড়ি পথে নেমে এল, কিন্তু তাকে দেয়াল অতিক্রম করতে দেওয়া হল না। তারা বলল ঃ
—সৈন্যরা অতিক্রম না করা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো।
মেয়েটি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।
আর অপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে উপত্যকার নীচে একটা পিছল শিলাখণ্ডের ওপর আর একটা পিছল শিলাখণ্ড রাখা।
হিমেল বাতাস গর্জন করতে থাকলে সে দাঁতে দাঁতে চেপে রইল।
তাদের রাইফেলের মুখ নত করে একের পর এক সৈন্য পার হয়ে গেল।

Scanned with ACE Scanner

মুখ খোসাছাড়ানো কাঁচা ফলের মতো, চোখে তাদের মৃত্যুর নৃত্য। একজন চিৎকার করে বলল :

—কি খবর ?

মেয়েটি একটা জোর চিৎকারের ইচ্ছাকে অবদমন করল, তার বুক হয়ে উঠল ভারী। সবাইকে সে বলতে চাইল :

—খবরটা তোমরা জান না ?

যদি জয়ী হতে তাহলে পুব দিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে তোমরা অগ্রসর হতে এবং আমরা এই বিরাট শহরে কোন সৈন্যকে দেখতে পেতাম না।

সাদ, রাইফেল থেকে যদি মরচে তুলে ফেলা যেত,

তাহলে কি তাতে নতুন করে বুলেট ভরতে ?

যদি তাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলোকে স্তব্ধ এবং বিমানগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া যেত, তাহলে কি তুমি পুরোনো রাইফেল আবার কাঁধে তুলে নিতে ?

তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আমি দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।

দেশটা কাছে দূরে ছড়িয়ে আছে এবং বড় বাজারটাও শহরের আগে।

আমার আশঙ্কা আমি ওখানে গেলে নিষাদেরা আমাকে ধরে উপহাস করে বলবে :

—মেয়েটি আবার একা ফিরে এসেছে।

সেই পরিত্যক্ত বাড়ীতে ফিরে গিয়ে শোক-সূচক কাল পোশাক পরে থাক,

নিস্তব্ধতা তোমার চিরদিনের সঙ্গী হোক।

হঠাৎ মেয়েটির দেহের মধ্যে একটা উষ্ণপ্রবাহ বয়ে গেল।

উষ্ণ নিশ্বাসের শিখা যেন তার উন্মুক্ত গলায় স্পর্শ করল।

তার চোখের সামনে ভেসে এল রাইফেলের নল।

বন্দুকটি মরচে ধরা নয়, তার চার দিকে শুকনো রক্ত।

সাদের মুখে ফুটে উঠল এক করুণ ব্যর্থ হাসির রেখা :

—এখন খুশি তো সেকিনা ?

মেয়েটি তাকে সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরল, আনন্দে নেচে উঠল তার মন।

সাদা পতাকার উজ্জ্বল দৃশ্যে বাজার ভরে গেল।

ষাট বছরের সেই বুড়ো একটা গাধার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল :

—এগিয়ে যাও, দিনগুলো কেমন বদলে গেছে।

সে বলে উঠল : আমাদের বাপ পিতামহের কাছ থেকে একই জাতীয় কথা শুনেছি। কি বাজে কথা !

Scanned with ACE Scanner

গালফোলা লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল,
শুকনো ভাজা মুরগীটা ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিল।
এক যুবক বিক্রেতার কর মর্দন করে বলল: আমাকে দুটো টাটকা মুরগী দিন।
—যে আজ্ঞা।
সাদ চিৎকার করে:
—তুমি কাঁদছ?
হ্যাঁ, আমার প্রিয়তম।
চল আমরা চলে যাই আর এই নগরকে বিদায় জানাই।
আমরা আবার ফিরে আসব এই দেশে,
তাঁর দেহকে স্থানান্তরিত করব এই মুক্তগ্রামে।
জীবনের কাছে তিনি ছিলেন পরিচিত,
মৃত্যুর মধ্যেও তিনি অপরিচিত থাকবেন না।
সেকিনা কেঁপে ওঠে। কুঞ্চিত ভ্রূর মধ্য দিয়ে সে এপাশ ওপাশ তাকায়।
পায়ের তলায় শুকনো হলদে পাতাগুলো জলবিন্দুতে ঘস্‌খস্‌ করে ওঠে।
মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে।
সূর্যের চারদিকে কালো মেঘ।
সে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।
চোখের জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশে দেয়ালে পড়ে শুকিয়ে গেল।
......সাদ......সাদ......সাদ......
তার চারপাশে সবাই বধির হয়ে গেছে।
বাজার জায়গাটা হচ্ছে এক অন্ধকার স্বৈরাচারী পৃথিবী।
সে ব্যাভিচারিণী নয়, সে ধর্ষিতা।
এখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করার অর্থ একটা পিছল শিলাখণ্ডের ওপর আরেকটা পিছল শিলাখণ্ড রাখা।
আর বাতাস যে কোন মুহূর্তে আবার শিস্‌ দিয়ে উঠতে পারে।

বরেণ্য ভট্টাচার্য

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইন প্রবন্ধ

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইন প্রতিরোধ সাহিত্যের উত্থান

ঘাস্‌সান কানাফানি

১৯৪৮ সালে জিয়োনিষ্টদের (ইহুদীদের) পালেস্তাইন দখলের পূর্বেই পালেস্তাইনের সাহিত্য আরব সাহিত্যের মূলধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। যদিও এ সাহিত্যের মূল বিকাশ কেন্দ্র ছিল কায়রো এবং সেখানে প্রাধান্য ছিল মিশরীয়, লেবাননী এবং সিরীয় লেখকদের। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে লেখক গোষ্ঠী সমগ্র আরব সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তারাই ছিলেন এ সাহিত্যের নবযুগের বিপ্লবী দিশারী। নিকট অতীতের বন্ধ্যাত্ব ও অবক্ষয় থেকে তারা পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন আরব সাহিত্যের। পালেস্তাইনের প্রখ্যাত লেখকগণ সাহিত্য-কেন্দ্রগুলোতে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে সমাদৃত হয়েছিলেন, আর বিকাশলাভ করেছিল তাঁদের প্রতিভা।

১৯৪৮ সালে জিয়োনিষ্ট দখলের পরে পালেস্তাইন বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগামী অংশ নির্বাসনে যেতে বাধ্য হলেন। সেখানে তারা ঐতিহ্যময় আরব সাহিত্যের বিশাল ভিত্তির উপর 'নির্বাসনের সাহিত্য' রচনা করার ব্যাপক প্রয়াস পেলেন। জিয়োনিষ্ট অত্যাচারীরা ছোট-বড়ো শহরের বুদ্ধিজীবীদের এবং লেখকদের বিরুদ্ধে নির্দয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলো এবং শহুরে বুদ্ধিজীবীমহলকে তারা মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করলো। ছোট-বড়ো শহরগুলোই ছিল গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক উদ্দীপনার উৎস। তাই ইহুদীরা গ্রামাঞ্চলের আরব জনগণের সামনে বহু-কন্টকিত সাংস্কৃতিক অবরোধ খাড়া করলো এবং সংস্কৃতির সমস্ত উৎসমুখকেই বন্ধ করে দেওয়া হল।

সাংস্কৃতিক অবরোধ

প্রথমত; যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ লেখক-শিল্পীর জন্ম দেয়, সামাজিক অবস্থার দরুন অধিকৃত এলাকায় বসবাসকারী বিশাল আরব জনগণের অধিকাংশই তা থেকে বঞ্চিত হলেন। উপরন্তু গ্রাম থেকে নবাগত প্রতিভাকে আবাহন ও পরিপোষণ করতো নিকটস্থ যেসব শহরগুলো তা পরিণত হোলো নিষিদ্ধ শত্রুপুরী ইহুদী শহরে।

দ্বিতীয়ত, অধিকৃত এলাকার আরব জনগণকে সাহিত্যের আধুনিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা তথা এ ধারার সম্পর্কজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বাতিল করার উদ্দেশে নগরগুলিতে আরব-সাহিত্যের উপর সাংস্কৃতিক অবরোধের প্রাচীর তোলা হল।

তৃতীয়ত, হামলাদারদের সামরিক শাসন তাদের স্বার্থানুগ এমন এক ধরণের সাহিত্য আরব জনগণের উপর চাপিয়ে দিল যে সাহিত্য অধিকৃত এলাকার আরবদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কোনক্রমেই প্রতিফলিত করে না। যে কোন প্রকাশনাই ছিল সীমিত এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত—এর একদিকে ছিল শাসক কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে জিয়োনিষ্ট প্রকাশন সংস্থাসমূহ। আরবী ভাষায় লেখা প্রকাশের জন্য নানারকম সর্ত আরোপিত হলো এবং তার দ্বারা আরব জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই দাবিয়ে রাখা হল। তাছাড়া, সাহিত্য-পিপাসু আরবদের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিপথচালিত করার জন্য ইহুদী শাসকরা পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় মামুলী ধরণের বহু বাজে বই আমদানি করলেন। প্রকৃত আরব সাহিত্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির ফলে তারা এই সহজ কৌশল গ্রহণ করে আরব পাঠকদের মনে জীবনবিমুখ পলায়নী (escapist) সাহিত্যের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলেন।

চতুর্থত, সাংস্কৃতিক অবরোধ চাপাতে গিয়ে জিয়োনিষ্টরা দেখলেন, তাদের কাজে বাধা আসছে না। কারণ অধিকৃত এলাকায় বিশেষত গ্রামাঞ্চলের আরবদের মধ্যে বিদেশী ভাষার জ্ঞান ছিল নীচু মানের এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য আন্দোলন থেকেও তারা ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সাংস্কৃতিক অবরোধের কঠিন চাপ থাকা সত্বেও আরব জনগণ তাদের প্রাণশক্তির পুনরুত্থান ঘটালেন, ধীর-মন্থর গ্রাম্য এলাকায় ধীরে ধীরে জন্ম নিল এক শিল্পসম্মত প্রকাশ-ধারা ও সংগ্রাম-রীতি, তার নাম জনপ্রিয় কবিতা। কারণ এ হেন অবরোধের পরিস্থিতিতে, কবিতাই দেয় সর্ব প্রথম প্রতিরোধের ডাক। কবিতা ছড়িয়ে পড়তে পারে মুখে মুখে—মুদ্রিত না হয়েই। বিবাহ-বাসর এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো তাই হয়ে উঠলো কবিদের মঞ্চ। তারা এইসব উৎসবগুলিকে পরিণত করলেন সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য-মণ্ডিত অনুষ্ঠানে। কবিতা গাওয়া হতে থাকলো সমবেত জনতার কণ্ঠে এবং তা হয়ে উঠলো তাদের হৃদয়ের পতাকা। এ ধরণের সমাবেশের জনপ্রিয় গানকে মাহমুদ দারবিশ এবং অন্যান্য পালেস্তাইন কবিরা পরে আরো দৃঢ় বনিয়াদের উপর দাঁড় করালেন। তারা প্রিয়জন ও মাতৃভূমিকে বাঁধলেন এক সূত্রে এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলোকে করে তুললেন মুক্তির সঙ্গীত ও নিপীড়ণ

Scanned with ACE Scanner

বিরোধী প্রতিরোধের স্তরে। 'নির্বাসনের সাহিত্য' ব্যাপকভাবে আরব সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও, অধিকৃত এলাকার প্রতিরোধ কবিতার বিকাশই আরব সাহিত্যকে একটা নতুন পর্যায়ে উন্নীত করে দিল।

পালেস্তাইনের যেসব লেখক মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন নির্বাসনের বছরগুলিতে তাদের লেখাও একটা ব্যাপক গুণগত বিকাশের মধ্য দিয়ে পার হলো। সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই, বিপর্যয় নেমে আসার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এসেছিল এক স্তব্ধতা—আঘাতজনিত বিহ্বলতা, তারপর তা পরিবর্তিত হলো স্বদেশপ্রেমের কবিতার উচ্ছ্বসিত কলরবে। তা সাড়া জাগালো জন-চেতনায়। সে চেতনা তখন আঘাতটা সামলে নিলেও সবকিছুর উপরই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আর সমকালীন আরব ও আন্তর্জাতিক-সাহিত্যের ধারা এ সাহিত্যে যে প্রভাব ফেলেছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাবলীলতা এবং গভীরতা। এই দ্বৈত প্রভাবের ফলে নির্বাসনের সাহিত্য বিষয়ে ও আঙ্গিকে এক গুণগত পরিবর্তনের স্তর পার হয়ে এলো। আধুনিক ধারাগুলির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলো কলা কৌশলগত বিন্যাসে। আর জনচেতনা অভিজ্ঞতার যে স্তরটা পার হয়ে এসেছে তা-রূপ পেলো বিষয়বস্তুতে।

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে নির্বাসিত কবিরা উচ্চকণ্ঠ দেশপ্রেমের কবিতার পরে আঙ্গিকের পুরোনো ধারা বর্জন করলেন, বর্জন করলেন প্রবল উৎসাহ এবং আবেগ। কারণ তারা কবিতায় তখনকার বিপর্যয়ের বাস্তব দিকটি বাদ দিয়ে ছেড়ে গভীর বেদনাময় এক অনন্য রূপকল্পের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

অধিকৃত পালেস্তাইন এলাকার আরব সাহিত্যের ব্যাপারটা ছিল মূলতই আলাদা।

জনপ্রিয় কবিতা

ক্ল্যাসিক্যাল (প্রাচীন ঐতিহ্যময়) কবিতার সঙ্গে জনপ্রিয় কবিতাও হয়ে উঠলো প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশের দশক থেকে পালেস্তাইনে জনপ্রিয় কবিতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বস্তুত পালেস্তাইনবাসীরাই নির্বাসন-জীবনে যাওয়ার সময় যে সমস্ত ছড়া ও গান বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, পূর্ব-আরবের দেশপ্রেমিক সভা-শোভাযাত্রায় প্রায় সর্বদাই তা প্রতিধ্বনিত হতো। ১৯৩৬ সালে ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ করা

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনের এক অজ্ঞাতনামা সংগ্রামী শহীদের দুর্লভ কবিতাটির সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোকের সংখ্যা পালেস্তাইনে বিরল। কবিতাটি ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে গ্রামে এবং হয়ে উঠেছিল শ্রদ্ধাপ্লুত প্রার্থনার মতো :

হে রাত্রি,
বন্দীকে শেষ করতে দাও তার বিলাপ,
কারণ যখন ঝটপট্ করে উঠ্‌বে ভোরের সতেজ ডানা,
তখন তার দেহ দুলবে বাতাসে
বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন এখন,
টুকরো হয়ে গেছে পান পাত্রগুলো।
হে রাত্রি, থেমে থাকো—যতক্ষণ না
শেষ হয় আমার শোক গাথা।

তুমি কি ভুলে যাবে আমার কথা
ভুলবে কি আমার দীর্ঘশ্বাস।
হে অবিচার, ভুলো না
কেমন করে এই দুর্বহ সময় কাটালাম
তোমার হেফাজতে।

ভেবো না আমার অশ্রু ঝরছে ভয়ে
ঝরছে আমার মাতৃভূমির দুঃখে
আর বাড়ির কটি ভুখা বাচ্চার মুখের এক মুঠো অন্নের কথা ভেবে,
আমি চলে গেলে তাদের খাওয়াবে কে ?
আমার তরুণ ভাই দুটিকেও ফাঁসিতে লট্‌কালে ?
কেমন করে আমার স্ত্রী দিন গুঁজরাবে ?
আমার আর তার কোলের বাচ্চার জন্য চোখের জল ফেলে ?
তবুও কি আমি তার কঙ্কন তার বাহুতেই
যাব রেখে
যখন পিতৃভূমি উদ্ধারের যুদ্ধ দিয়েছে ডাক
বন্দুক কেনার ?

১৯৪৮এ পালেস্তাইনের পতনের পর জনপ্রিয় সাহিত্য নিপীড়িত জনগণের

Scanned with ACE Scanner

দুঃখযন্ত্রণা প্রকাশ করতে লাগলো। যে সর্বনাশা দুর্যোগ জনগণকে পর্যুদস্ত করছিল, তা পরস্পর-সম্পর্কের প্রশ্নে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। ইহুদী হামলাদারি তাদের স্বামী-স্ত্রী মা-বাবা ভাই-বোনের মৃত্যু ঘটিয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙে গেছে নির্বাসনের ফলে। এই সামাজিক বিপর্যয় পালেস্তাইন জনগণের সমগ্র অংশকে এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে অন্তরের গভীরে দিয়েছিল নাড়া। হামলাদারির ঠিক পরে পরেই যে কবিতা রচিত হয়েছিল তার বেশির ভাগই তুলে ধরেছিল বাস্তব অবস্থা এবং মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা আর প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হবার আকুতি। যাই হোক, আরব জনগণের কঠিন জীবন এবং জাগ্রত চেতনাবোধ অনধিকারী শাসকদের বিরুদ্ধে একটা জনপ্রিয় প্রকাশ মাধ্যম খুঁজে নিল। ছোট ছোট দার্শনিক প্রশ্ন দিয়ে সুরু করলেও জনপ্রিয় কবিতা ক্রমশ পালেস্তাইনবাসীদের নারী ও দেশকে এক করে দেখার এবং উভয়কে ভালোবাসার এক গভীর সত্যে পৌঁছে দিল আর ইহুদী হানাদারদের কালো হাতকে দেখাল বিদ্রূপের দৃঢ় মুষ্টি।

রোগ সারবার নয়

গ্যালিলিতে যখন বিবাহ-আসর জনপ্রিয় কবি ও চারণদের কাব্যগাথায় হয়ে উঠলো বিক্ষোভ-প্রকাশের অদ্বিতীয় প্রকাশ্য মঞ্চ—কিন্তু বিক্ষোভকারীদের উপরও গুলিবর্ষণ সুরু করলো জিয়োনিস্ট দখলদারি ফৌজ। গ্রেপ্তার হতে লাগলো কবিরা। কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হোলো তাদের গতিবিধির উপর, তা সত্ত্বেও আরব জনগণের প্রাণশক্তিকে আর দাবিয়ে রাখা গেল না। প্রায়ই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধতো আরব বিক্ষোভকারীদের এবং প্রত্যেকটা সংঘর্ষই জন্ম দিত একটা করে নতুন গান। জনপ্রিয় কবিতায় সাড়া তুলত প্রতিটি বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতি। এ কবিতায় গাঁথা হয়ে যেতে থাকে প্রতিটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সংগ্রামী জনগণের প্রতিটি হৃদয়াবেগ।

এই জনপ্রিয় কবিতা জন্মায় যেখানে সেখানে, সর্বত্র—ঘরে, বিবাহ-আসরে, শবযাত্রায় আর কাজ করতে করতে। প্রধানত এ একটি গণ-সৃষ্টি যা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে উৎপীড়নের কোনো যন্ত্রই একে আর দমাতে পারে না। পারে না এর স্রষ্টাকে খুঁজে বার করে শাস্তি দিতে কিম্বা তাকে নীরব করে দিতে। ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে অবশ্য এ কথা খাটে না।

Scanned with ACE Scanner

অবরোধ অমানবিক উপায়ে ক্ষতি করতে শুরু করলো প্রচলিত সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষার। পুস্তক প্রকাশনা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হোলো জিয়োনিস্টদের হাতে। তাছাড়া বিপুল পরিমান সস্তা বাজে বই গুদামজাত করে বাজারে ছাড়া হোলো। উদ্দেশ্য—জনগণের সামনে ওগুলো ছাড়া পড়বার আর কিছু না রেখে তাদের বিপথে চালিত করা। সম্ভবত জিয়োনিষ্টরা অধিকৃত এলাকার আরব জনগণের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ করেছে তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে। তাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র যে অংশ স্কুলপর্ব শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢোকে তারাও বড় বেশি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অত্যাচারের শিকার হয়ে পড়ে। তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার বা তাদের নিজস্ব জাতি সত্বার এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলীর প্রতি অশ্রদ্ধা জাগানোর অবিরাম চেষ্টা চলতেই থাকে।

শিক্ষার বিধিনিষেধ

এই পরিস্থিতি আরবদের সংস্কৃতিবান প্রজন্মের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সমগ্র আরব জনগণের উপর সর্বস্তরে চাপিয়ে দেওয়া হয় অপসংস্কৃতির বোঝা যা আরবদের সাংস্কৃতিক মানকে নীচুতে নামিয়ে দিতে চায়। অধিকৃত এলাকার আরব বুদ্ধিজীবিদের জিয়োনিষ্ট সংস্কৃতি চক্রে ভিড়াবার অবিরাম ইজরায়েলী চেষ্টা চল্‌তেই থাকে। আরব বুদ্ধিজীবিরা জিয়োনিষ্টদের পক্ষে না বিপক্ষে—এ নিয়ে ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই, আরব-হীন কোনো সংস্থায় তারা যুক্ত থাকলেই হলো। তাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য কোনো আরব বুদ্ধিজীবি জিয়োনিষ্ট কোনো সংস্থার অনুমোদিত হলেই আরবী ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি পেতেন এবং আরব রাজধানীগুলিতে প্রকাশিত পুস্তকগুলির পুনর্মুদ্রণ করবার অনুমোদন লাভ করতেন যদি না পুস্তকগুলি আরব জাতীয়তার প্রশ্নে সোচ্চার হয়। আরব দেশসমূহ থেকে আগত ইহুদীদের আরবী ভাষায় লিখতে এবং তাদের লেখা বই প্রকাশে উৎসাহিত করে বিষয়টাকে তারা আরো বিভ্রান্তিকর করে তুললেন।

ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরগুলিতে আরবী ভাষায় প্রেমের কবিতা ও প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছুই প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ ছিল বাস্তব জীবন থেকে পলায়নী মনোবৃত্তির রাজ্যে টেনে নেওয়ার একটা

Scanned with ACE Scanner

প্রচেষ্টা। যাই হোক, ১৯৫২ তে মিশরীয় বিপ্লবের পটভূমিকায় এলো দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিবর্তন। ইহুদী প্রকাশকরা প্রাপ্ত লেখার মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তনের সুরটা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলেন। ইহুদী কাগজগুলো এ সমস্ত জাতীয়তাবাদী লেখা প্রকাশে অস্বীকৃত হলে আরবরা গ্রামে গ্রামে কবিতা-আবৃত্তির আসর গড়লো। বিপুল উদ্দীপনা এবং বহু মানুষের মিলনের ফলে এই আবৃত্তি আসরগুলো হয়ে উঠলো একান্তই দেশপ্রেমের বিক্ষোভ আর প্রতিবাদের আসর। খুব তৎপরতার সাথে শাসকরা এ বিষয়ে খোঁজ খবর এবং কবিদের জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলো। যে সব কবি আবৃত্তির আসরে যোগ দিয়েছিলেন তাদের আটক করে জেরা করা হতো। ব্যাপারটা বুঝতে পারার অল্পদিনের মধ্যেই নিষিদ্ধ হয়ে গেল আবৃত্তির আসর। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত অবশ্য দমাতে পারলো না পাঁচ বছরের একটানা নির্যাতন থেকে উদ্ভূত প্রচণ্ড শক্তি।

অধিকৃত এলাকার অভ্যন্তরে যা ঘটছিলো, বস্তুত তার অপরদিকে নির্বাসিত পালেস্তাইন কবিদের বেলায়ও তাই ঘটলো। এ সময় নির্বাসনের কবিতা এক ক্রম-পরিবর্তনের পথ অতিক্রমন করছিল। উচ্চ কলোচ্ছ্বাস রূপান্তরিত হলো বেদনা এবং মুক্তির ইচ্ছার এক মিশ্র আর্তিতে, তারপর তা বিকশিত হয়ে উঠলো প্রচণ্ড আশা-উদ্দীপনায়। বাস্তব পরিস্থিতির অনিবার্যতা বেদনা আর তিক্ততার মধ্য দিয়ে ছেদ টানলো হতাশার অধ্যায়টার। এই একই ব্যাপার অধিকৃত এলাকার আরব লেখকদের বেলায়ও নানাভাবে দেখা দিল। প্রেমের কবিতাও যে সময় জনমানসকে উদ্দীপিত করতে হার মেনেছিল সেই হতাশার পর্যায় অবশেষে হোলো শেষ। শুধু কবিদের সামনে বিশেষ করে এলো একটা নতুন প্রশ্ন—সমগ্র পালেস্তাইন সমস্যা। সমস্ত ব্যাপারটা নির্বাসনের কবি লেখকদের থেকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তারা এই সমস্যাটার সম্মুখীন হলেন—তারা বেছে নিলেন প্রতিরোধ।

মাহমুদ দারবিশ

জিয়োনিস্ট দখলদারির দশ বছর বাদে পালেস্তাইনের অধিকৃত এলাকার ব্রাওয়া গ্রামের মাহমুদ দারবিশ নামে এক তরুণ তার লেখায় চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অধিকৃত এলাকায় সেই সময়ে আরব সাহিত্যের প্রেমের কবিতা থেকে জাতীয়তাবাদী কবিতায় মহান উত্তরণের হারানো সূত্র

Scanned with ACE Scanner

সম্বন্ধে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তার কবিতায় আমরা দেখি ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়েছে একসঙ্গে নারী ও মাতৃভূমি।

নির্বাসনের সাহিত্যে একই ব্যাপার ঘটলো আরো কিছুকাল পরে, কিন্তু অধিকৃত এলাকায় প্রতিরোধের সাহিত্যে এলো আরো গভীর আরো নিবিড় এক বিশ্বাস জাগানো সুর, মূর্ত হোলো নারী ও মাতৃভূমি এক ঘনিষ্ঠতর রূপে।

১৯৪৮ এর পরবর্তীকালে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের কবিতা শুধু একাকীত্ব ও বিচ্ছেদ বেদনার তীব্র ব্যথাকেই ঘোচালো না, নিজেদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপনেও সচেষ্ট হোলো। কেননা হঠাৎই তারা আবিষ্কার করলেন, বিদেশী জনতার মাঝখানে তারা হচ্ছেন এক অসহায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী

পরাজয় এবং স্বদেশ হারানোর যন্ত্রণা যখন চরমে পৌঁছালো, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাগ্রত হোলো তাদের সমস্ত আবেগ ও উপলব্ধি। নতুন পরিস্থিতিতে অসহায় আরব সংখ্যালঘুরা নিজেদের অস্তিত্ব এবং শক্তি উদ্বোধণের জন্য এক নতুন ধরণের সম্পর্ক বিকশিত করে তুললেন, তা হচ্ছে রুখে দাঁড়ানোর সাহস এবং লড়াইয়ের তেজ।

দারবিশ এবং অধিকৃত এলাকার অন্যান্য তরুণ কবিরা এই দুটো আবেগকে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাফল্য লাভ করেছিলেন। বস্তুত এ দুটো আবেগই এক এবং একসূত্রে গাঁথা—অধিকৃত এলাকার সাহিত্যের প্রতিরোধ সংগ্রামকে সঞ্জীবিত করার ব্রতে উৎসর্গীত। প্রতিরোধ একটা অনায়াস সাধ্য কাজ নয়, এর অর্থ—একটা বিষধর ধূর্ত শত্রুর সঙ্গে বিলম্বিত প্রতিদিনের লড়াই।

জিয়োনিষ্টরা শুধু দমন-পীড়নের মামুলী অস্ত্রই ব্যবহার করেনি, আরো একটা অস্ত্র তাদের ছিল এবং তা অনেক বেশি মারাত্মক। সে অস্ত্র হচ্ছে বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং সর্বস্তরে পরিকল্পিত পরিবর্তনের (orientation) কার্যক্রম। একদিকে রাষ্ট্র তার পত্র-পত্রিকা, বই, প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা-প্রকল্প এবং সাংস্কৃতিক জগতে পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করছিল। অন্যদিকে সরকারের এ সমস্ত ফাঁদ যারা এড়িয়ে যেতো পারতো তাদের ধরবার জন্য ছিল সরকার বিরোধী জিয়োনিষ্ট দলগুলি—সরকার বিরোধী বিভ্রান্তিকর মতামতের বেসাতি নিয়ে।

Scanned with ACE Scanner

প্রতিরোধ সাহিত্যের প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চারী যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে সমস্ত বিরোধী ইহুদী সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আরবদের দ্বারা 'আল্ আরধ্' (দেশ) নামে একটি ফ্রন্ট গঠন। ১৯৫৯ সালে আল্ আরধ্ একটা বুলেটিন বার করলো ইজরায়েল সংবিধানের একটি ধারাকে মূলধন করে। আইনের এই ধারায় আছে—প্রকাশন বিভাগের অনুমতি ছাড়াই যে কোনো নাগরিক বছরে একটা বুলেটিন বার করতে পারবে। ১৯৫৯ সালে এই সংস্থা নানান নামে তেরখানা বুলেটিন বার করলো। শেষ সংখ্যাটা ছিল পোর্টসৈয়দ বিজয় দিবস উপলক্ষে এবং উপরের পাতায় প্রেসিডেন্ট নাসেরের ছবিসহ তার সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি ছাপান হয়েছিল। এ সংখ্যাটা কর্তৃপক্ষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালো।

সে সময় আরব লেখকদের লড়াই অথবা সমঝোতার মধ্যে পথ বেছে নিতে হতো। যেসব আরব রাজনীতি করতেন তাদেরও ঠিক একইভাবে পথ বেছে নিতে হলো। ইজরায়েলের কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হোলো—আরব ও ইহুদী পার্টিতে। আরব পার্টির হাতে এলো 'ইত্তেহাদ' পত্রিকাটির দায়িত্ব। তারা এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে সাহসের সাথে এর দরজা খুলে দিলেন প্রতীক ধর্মী আরব লেখকদের সামনে। এল্ রামার কবি শামী-আল্-কাসেম একটি প্রতীক কবিতার অংশ বিশেষ প্রকাশ করলেন। এতে ছিল চারটি গান—অধিকৃত এলাকার আরবদের নিয়ে সূক্ষ্ম-সংহত প্রতীক এতে ছিল না। তোয়াফিক ফয়াদ প্রকাশ করলেন উন্মাদাগার (The Madhouse) বলে একটি প্রতীক ধর্ম্মী নাটক এবং বিকৃতদেহী (The disfigured) বলে একটি গল্প। মাহমুদ দারবিশ তার 'পালেস্তাইন এর প্রেমিক' (A lover from Palestine) কবিতার অংশ বিশেষ প্রকাশ করলেন এতে।

প্রতিরোধ সাহিত্যের আসল মঞ্চ হিসাবে কিন্তু রয়ে গেল গ্রামের উন্মুক্ত স্থান এবং উৎসব অনুষ্ঠান আর মুখে মুখে চলতো তার ব্যাপক প্রচার।

অধিকৃত এলাকার কবিতায় নির্বাসনের কবিতার মতো বিলাপ অথবা হতাশার সুর ধ্বনিত হলো না বরং তাতে মূর্ত হয়ে উঠলো অত্যাশ্চর্য আশা আর স্বতস্ফূর্ত বিপ্লবী উন্মাদনা। দ্বিতীয়ত—আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়তো অধিকৃত এলাকার আরব কবিতায়। এ ঘটনাগুলিকে সুসংবদ্ধ কাব্যরূপ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল কবিতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অধিকৃত এলাকার আরবরা দারবিশের 'গাজার লায়লা' (Laila of

Scanned with ACE Scanner

Gaza) কবিতাটি আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত। ত্রিশক্তির আক্রমণকালে ইহুদীরা ঐ অঞ্চলে ঢোকার পর, গাজার এক আরব-দুহিতার ভাগ্যবর্ণনা করেছেন কবি এ কবিতায়। ধ্বংস করা হয়েছে যার গ্রাম, বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছে যাকে—কবি দুঃখ প্রকাশ করছেন সেই মেয়েটির জন্য, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাকে, উদ্বুদ্ধ করছেন প্রতিরোধ-সংগ্রামে।

"তোমার ধূলায় হে স্বদেশ, আমি
বুক ভরে নিই উষ্ণতা
আর যৌবনের উচ্ছলতা।
ডুমুরের বাগ, সোনালী প্রান্তরে
আমার বাস।
তোমার মাটির গভীরে প্রথিত আমার মূল
শত্রুর হাত কি তাকে উপড়াতে পারে কখনো?
আমি তো বন্ধু আসিনি হেথায়
প্রিয়জনদের বিয়োগ-ব্যথায়
শোনাতে বিলাপ।
নির্বাসিত লক্ষ হৃদয়ের
তপ্ত ক্রোধ
আবদ্ধ আমার রক্তাক্ত ক্ষতে।"

দারবিশের কবিতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের কাব্যধর্মী উৎকর্ষের গুণে এক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের পথে উন্নীত হোলো। কবি শামী আল্ কাসেমের সঙ্গে তিনি ক্রমাগত প্রাচীন কাব্যরীতি বর্জন করে প্রাচীন কাব্যের গূঢ় আবেগ ধর্ম বজায় রেখে আধুনিক রীতি প্রবর্তনের আন্দোলন শুরু করলেন।

শামী-আল্-কাসেম

অধিকৃত এলাকার আরব কবিরা আরব দেশগুলির ঘটনাবলী বাঁধলেন গানে এবং সম্প্রতিকালে আরব রণ-রঙ্গমঞ্চে যে লড়াই ও সংঘর্ষ জমে উঠেছে তাতে অন্যান্য আরব কবির চেয়ে তারা দ্রুত সাড়া দিলেন। তাছাড়া, তাদের কবিতায়

Scanned with ACE Scanner

এ ঘটনাগুলো ব্যক্ত হলো আশা ও সংকল্পের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে। বহির্জগতের সঙ্গে কবির সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত তার নিজেরও ভাগ্য। এ মর্মে শামী আল্-কাসেমের অভিব্যক্তি :

'প্রিয় দিগন্তব্যাপী
কোনো উষাই হয় না উদ্ভাসিত
রক্তাক্ত ক্ষতের দৃশ্য ব্যতীত
আমার জানালায়।
লোহার কালো সিন্দুকে বন্দী ব্যথা
বেদনায় নীল রোদে পোড়া তায়েজের হৃদয়,
স্বাধীনতার পদ্মকে প্রস্ফুটিত করো
জন্মায় সে যে রক্তরাঙা পাহাড়ের কোলে
আর বয়ে আনে শীতল জলধারা
তৃষ্ণার্ত মরুর বুকে
আমার আরব মরুর বুকে।'

'আমার আরব মরুতে' কথাটির মধ্যে 'আমার' উপরে যে বিশেষ জোর দিয়েছেন কবি তাতেই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটি আরও আশা ও সংকল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্ত হয়েছে।

'কালো চা, কফি এবং ক্যাতের গুহাগুলি
রূপান্তরিত আজ সেনাছাউনীতে
আসুয়াত আর পোর্ট সৈয়দ থেকে
আমার লোকেরা এসেছে অগনন
জয় স্থির নিশ্চিত এখন।

তিনি কি নিজের সমস্যার কথা বলছেন না ইয়েমেনীয় সমস্যার কথা? সন্দেহাতীত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, সরল সত্য ও প্রাণ খোলা মানসিকতায় তিনি দারবিশের মতো একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাবালীকে দেখেন—যখন তিনি নারী ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাকে এক করে দেখেন। অধিকৃত এলাকার বাইরের আরবদের লড়াই এবং প্রতিরোধ সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে এক সুগভীর স্বাভাবিক সম্পর্ক। অধিকৃত এলাকার আরব কবিরা স্বভাবতই তাদের

Scanned with ACE Scanner

নিজেদের এবং আরব দুনিয়ার দৈনিক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক বেশি সজাগ। কারণ অন্যায় দখলদারি এবং আরব ঐতিহ্য ও ব্যক্তি মানসকে ধ্বংসের অবিরাম ইহুদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তারা সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আরব জনগণের প্রতিরোধের অস্ত্র—ধৈর্য, উপেক্ষা এবং বিদ্রূপ।

অত্যাচারী দানব যখন সতর্ক সজাগ এবং নিপীড়িতরা নির্ভীক, এমন অবস্থায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশে এবং সমগ্র পরিস্থিতির জরুরী মোকাবিলায় জনগণের শেষ অস্ত্র—ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য। প্রতিরোধের জনপ্রিয় কবিতায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্চর্য বিন্যাস। পরিবর্তনশীল ঘটনাবলি এবং পরিবর্তন যে একদিন আসবেই আর দুঃস্বপ্ন হবে অতীতের বস্তু—এ সত্যের গভীর উপলব্ধি থেকেই এটা সম্ভব হয়েছে। জনগণের চেতনার গভীরে সুপ্ত এক দৃঢ় সংকল্প থেকেই এর জন্ম। সত্য ও সুনিশ্চিত এর ভিত্তি—কেননা গ্রামাঞ্চলই এর প্রসূতি।

বিদ্রূপের দংশন

প্রতিরোধ সংগ্রামের গভীরতা এবং অধিকৃত এলাকার আরব জনগণের প্রাণশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগে গল্পটি আরব কম্যুনিষ্ট পত্রিকায় বেরিয়েছিল একটি ছোটো খবরের আকারে, ছোটগল্প হিসাবে নয়। কিন্তু শিল্পীর সৃজনী স্পর্শ তাকে রূপ দিল যথার্থ একটি ছোটো গল্পে। শীগ্‌গীরই এটি হয়ে উঠলো অধিকৃত এলাকার প্রতিরোধ সাহিত্যের এক সম্পদ :

'দেখা যাচ্ছে এই জমিটা নিয়ে রাষ্ট্র ও ইব্রাহিম এল্ হামিদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে'—জমি জরিপ করতে এসে এই বলে যখন সরকারী আমিন আরম্ভ করলেন, জমির মালিক আবু হামেদ তখন তেমন গুরুত্ব দিলেন না। শুধু বললেন—'রেজিস্ট্রি, রেজিস্ট্রি! বললেই হলো, আরে বাবা কাগজ-কালির চেয়ে সস্তা তো কিছু নেই—আর আমি আমার জমিও দিচ্ছিনে।'

সে চাষ-আবাদ করে চললো ঐ জমিতে, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঐ জমিতে সে এ কাজই করে এসেছে। অল্প বয়স থেকে সে বাবাকে ঐ জমি চষতে সাহায্য করেছে—বাবার মৃত্যুর পরও সে এই কাজই করে চলেছে।

সময় কেটে যায়। এক বছরের মতো বা তার কিছু বেশি কেটে গেল। আবু হামেদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল আমিনবাবু কী রেকর্ড করেছেন। এমন

সময় জমি-বিরোধের মামলায় হাজির হবার জন্য হাইফা-কোর্ট থেকে সে সমন পেলো। নির্ধারিত দিনে আবু হামেদ হাইফা চললো। বুড়ো বাপের সঙ্গে নিজের কাজকর্ম ফেলে চললো তার ছেলে। উচ্চ কণ্ঠে তার নাম ডাকা হোলো। আবু হামেদ বিশ্রাম-ঘর ছেড়ে ছেলের সঙ্গে আদালত কক্ষে ঢুকলো। বিচার সুরু হলো।

বিচারক তাকে প্রশ্ন করলেন—'মগডেল কুরুম এলাকায় জমি—দাগ নং ৪৮, ব্লক নং ১৯৭০—তাতে তোমার মালিকানাসত্ব তুমি প্রমান করতে পারো ?'

—'হ্যাঁ হুজুর, আমার স্বর্গত পিতার কাছ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে এটা পেয়েছি।' আবু হামেদের জবাব,—'আল্লা আমার এবং আপনার পিতার আত্মাকে শান্তি দিন।'

—'বাজে কথা বন্ধ করো।' বিচারক বললেন—'তোমার বাবাকে এ মামলায় জড়িয়ো না। তোমার কাছে প্রমানের কাগজপত্র কি আছে তাই দেখাও ?'

একটু চিন্তা করে আবু হামেদ বললো—'আমি বলছি, হুজুর, এটা বাবার থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ১৫ বছর বয়স থেকে এটা আমি চাষ করে আসছি।'

—'এটা কোনো প্রমানই নয়। বেশ, এ জমিটা ষাট শতাংশ হচ্ছে পাথর—সুতরাং এটা রাষ্ট্রের সম্পত্তি।' বিচারক বললেন

—'ষাট বা সত্তর শতাংশ কি হুজুর—সবটাতেই ট্রাক্টর চলে, হুজুর।' আবু হামেদ চেঁচিয়ে উঠলো—'এখানে সেখানে এক আধটা পাথর থাকতে পারে, কিন্তু ডুমুর গাছ বা আঙ্গুরলতা জন্মায় সর্বত্র। এটা নিস্ফলা জমি নয়। আমার বাবা সারাটা জীবন এ জমি পাথর পরিষ্কার করে গেছেন, আমিও তাই করছি। রাষ্ট্রের চোখে কি দখল করবার জন্য আর কোনো লোভনীয় জমি পড়ছে না ?'

এই শুনে বিচারক বললেন—'আবার তোমাকে বল্‌ছি, বাজে বকবক থামাও। রাষ্ট্র কারো সম্পত্তিতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে না। এটা হচ্ছে তার অধিকার…।'

—'এটা অধিকার ?' আবু হামেদ প্রশ্ন করলো,—'হুজুর, আমি জানি রাষ্ট্র হচ্ছে ধনী, আর আমি একটা হাড়-মাস-সম্বল গরিব মানুষ। কি করে রাষ্ট্র আমার বিপক্ষে যায় ?'

বিচারক বললেন—'শোনো হে, তুমি এখন আদালতে আছো, তাই এসব বাজে বকবকানি বন্ধ করো।' তারপর একটু ভেবে তিনি সুরু করেন—'বেশ,

Scanned with ACE Scanner

জমিটার অর্ধেক পাবে রাষ্ট্র আর অর্ধেক পাবে তুমি এ বিষয়ে তোমার কি মত বলো ?'

আবু হামেদ মাথা নেড়ে বললো—'আমার বাবা হুজুর, কখনো বলেননি যে রাষ্ট্র বলে আমার এক ভাই আছে আর তাকে জমির ভাগ দিতে হবে।'

রেগে আগুন হয়ে বিচারক অস্থিরভাবে বললেন,—'বুড়ো, আমার সালিশী মেনে নিলেই ভালো করতে। এখন এ বিষয়ে কি করবে বলো ?'

এবারে হাবু হামেদ সঙ্কুচিত জবাব দিল—'আল্লার দোহাই, হুজুর, কিছু মনে করবেন না আপনার বিচারের রায় দেখছি একটা কালো কুকড়ানো শুকনো বীজদানা।' এই বলে সে তার লাঠিখানা নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে বিচারশালা বেরিয়ে এলো,—'অন্যায় বিচার বেশিদিন টেঁকে না।'

জমির সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ জ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সে বলেছে জমিতে 'সারা জীবন কাটানোর' কাহিনী। অধিকৃত এলাকার আরবদের জীবনের বাস্তব সমস্যাই সে তুলে ধরছে তার এই উক্তিতে : 'কালো কুকড়ানো শুকনো একটা বীজদানা।'

বামপন্থী ঝোঁক

অধিকৃত এলাকার আরব প্রতিরোধ কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশ্লেষণ করলে অনায়াসেই বলা যায়—এর বামপন্থী ঝোঁক রয়েছে। এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় ; জিয়োনিষ্ট শাসনের দাসত্ব শৃঙ্খলের মধ্যে, যে অবস্থায় অধিকৃত এলাকার আরবরা বাস করে এটা তারই ফল।

প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা যেতে পারে তিনটি সূত্রে :

১। অধিকৃত এলাকার আরবদের মধ্যে গ্রামের মানুষেরই বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা। অর্থাৎ তাদের বেশির ভাগই কৃষক। কৃষকরা হচ্ছে এমন একটা শ্রেণী—ইহুদী দখলদারীর পূর্বের অভ্যুত্থানগুলিতে তারা শুধু অগ্নিস্নানই করেনি, ১৯৪৮ এর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সিংহভাগটাও বহন করেছে তারাই।

২। এ কৃষকরা হচ্ছে নৃশংস দখলদারদের অত্যাচারের দৈনিক শিকার। দখলদাররা তাদের জীবিকা অর্জনের সামান্য উপায়টুকু পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে ব্যগ্র। অধিকৃত এলাকার বেশির ভাগ কবিতা গল্প ও প্রবন্ধে একথা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

Scanned with ACE Scanner

৩। দখলদারি রাজত্বটা যে স্রেফ ধনতান্ত্রিক চক্রান্তের ফল এবং পুঁজিবাদই যে এর শ্রষ্টা এবং একান্ত সমর্থক—এ সত্য প্রকটিত হচ্ছে আরবদের দৈনন্দিন জীবনে এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে।

সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী

এ পরিস্থিতি শুধু বামপন্থী সাহিত্য সৃজনের পথকেই উন্মুক্ত করেনি—অন্ধ উন্মত্ত আবেগের স্তর থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামকে উন্নীত করে তুলেছে এক দৃঢ়মূল সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষে।

অধিকৃত আরব এলাকায় ইহুদী সম্প্রসারণবাদী 'দৃষ্টিভঙ্গী' সম্বন্ধে যারা বিশদ ভাবে জানে না, প্রায়শই তারা আরব প্রতিরোধ সাহিত্যের তীক্ষ্ণগভীর পটভূমিটি বুঝতে পারে না। অধিকৃত এলাকার আরবদের বুকের পরে ইহুদী সম্প্রসারণবাদীদের গুরুভার চাহিদাগুলির যে জবাব দিয়েছে প্রতিরোধ সাহিত্য, তাতে মূল উপাদান রয়েছে দুটো—উপলব্ধির গভীরতা ও চেতনাশক্তি। আর তাই এই উপাদান দুটি এ সাহিত্যকে দিয়েছে শৈথিল্যমুক্ত প্রখর সচেতনতা।

'অধিকৃত পালেস্তাইনের মাটিতে জাত নতুন ইহুদী প্রজন্মের পালেস্তাইনের ভূমির প্রতি গভীর টান এবং ঘনিষ্ঠতর নাড়ীর বন্ধন হেতু বহিস্কৃত নবাগতদের চেয়ে ঐ ভূমির উপর তাদের দাবী হবে অনেক বেশি জোরালো—'

ইজরায়েলীদের এই অদ্ভুত দাবীর জবাবে মাহমুদ দারবিশ ভারি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন:

'রোমান ঘোড়াগুলো আমি চিনতে পারব
চারণভূমি বদলে গেলেও।
তারো আগে জানি
আমি যে একটা গর্ব মানব জাতির
এবং—আমি যে সারা পৃথিবীর
অনন্য এক সেরা সৈনিক।'

তারপর তিনি সমস্ত সমস্যাটা সগর্বে অতি সহজে চূড়ান্ত ভাবে তুলে ধরেন:

'পিঁপড়ের ডিমে তা দেয় না ঈগল
এবং সাপের ডিম—
লুকিয়ে রাখে সাপই।'

Scanned with ACE Scanner

তোয়াফিক জায়াদের কবিতায় আরো সরাসরি সংঘর্ষ। তিনি বলেন :

আমরা পাষাণ গুরুভার
তোমাদের বক্ষে—
ক্ষুধার্ত, নগ্ন, আমরা বেপরোয়া—
গান গেয়ে গেয়ে
ক্রুদ্ধ রাজপথ ভেঙে উত্তাল মিছিলে
কারাগার ভরে গর্বভরে—
ঘৃণার বারুদ-ঠাসা দুর্ধর্ষ ফসল
আমাদের উত্তর পুরুষ—।

যখন সরাসরি লড়াই বেঁধে যায় এবং সংঘর্ষের মুহূর্ত আসে—প্রতিরোধ-সাহিত্য প্রতিরোধের পর্ব পার হয়ে সুনির্দিষ্ট আক্রমণের পথে বাঁক নেয়। অধিকৃত আরব এলাকার সাহিত্যকর্ম দ্রুত পর্যালোচনা করলেই এ সত্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্তু সব অবস্থায়ই এ সাহিত্য হতাশার অশ্রু, বিলাপ এবং অভিযোগ-অনুযোগের উর্ধে। সব সময়ই বিপ্লবের বার্তাবাহী লড়াইএর জয়গান এ সাহিত্যের প্রাণ। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ সাহিত্য হচ্ছে স্থায়ী আরব বিপ্লবের ধারাবাহিক যোগসূত্রের একটা অংশ। এ সাহিত্য নিজেকে বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করে এবং তার উজ্জ্বল দিকগুলিকে গভীর সৃজনশীলতায় উদ্ভাসিত করে তোলে। স্বভাবতই এ কাজে অধিকৃত এলাকার বাইরের আরব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশি উদ্যোগ দরকার। প্রতিরোধের সাহিত্য নির্দ্বিধায় এ কঠিন কর্তব্য পালন করে, যোগ্যতার সঙ্গে সবার প্রয়োজন মেটায়। শুধুমাত্র সত্যিকার নির্ভেজাল আরব সাহিত্য উপহার দিয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছে অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত, সংগ্রামী আরব সাহিত্যিকদের সংগ্রামের প্রথম সারিতে দাঁড় করাতে পেরে। এ সাহিত্য তুলে ধরেছে আরব সাংস্কৃতিক জীবন থেকে দীর্ঘ-বিস্মৃত 'সংগ্রামী লেখকের' দৃষ্টান্ত, তুলে ধরেছে কাস্তের সাহিত্য—যে কাস্তে শাণিত হচ্ছে কালো কুকড়ানো দানাগুলোকে ছেঁটে ফেলার জন্য।

Scanned with ACE Scanner

অধিকৃত পালেস্তাইনের প্রতিরোধ সাহিত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে একান্ত ঘনিষ্ঠ করে দেখে এবং প্রতিরোধের দায়িত্ব তুলে নেবার প্রয়োজনে সুসংহত একই সূত্রের দুটো দিক বলে মনে করে। এ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকতর হয় যখন এ সাহিত্য প্রথম পর্বে, ইজরায়েলী আক্রমণ প্রতিরোধ এবং সমস্ত আরব দেশগুলি তথা সারা পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র উপলব্ধি করে।

অধিকৃত পালেস্তাইনে প্রতিরোধ সাহিত্যিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রতিশ্রুতি পূরণে সৃজনী শিল্পকর্মের সীমা রেখা পেরিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। বস্তুত তারা কোনো-না-কোনো ভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম এবং জাতীয়তাবাদী সংস্থাগুলির চৌহদ্দির মধ্যে তারা কাজ করেছেন এবং ইজরায়েলী দমন-নীতির তোয়াক্কা না করে লড়াই করে চলেছেন।

আসল কথা হচ্ছে, জাতীয় প্রশ্নে সচেতন প্রতিশ্রুতিই অধিকৃত পালেস্তাইনের প্রতিরোধ সাহিত্যকে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করেছে, দিকভ্রষ্ট হতে দেয়নি বিন্দুমাত্র। এ দায়িত্বের দিকগুলো অসংখ্য হলেও, সবগুলি দিকই আবর্তিত হয়েছে ইজরায়েলী দখলদারী বিরোধী লড়াইয়ের কক্ষপথে।

প্রতিশ্রুতির প্রশ্নটি ভাবানুগ (abstract) কোনো তত্ত্ব নয়—স্বাধীনতার প্রশ্নও তাই। এ দুটি প্রশ্নের নানা দিক, নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অধিকৃত পালেস্তাইনের প্রতিরোধী লেখকদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী কোনো সন্দেহ, অস্পষ্টতা বা সমঝোতার অবকাশ রাখে না—।

আভা সিংহ

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনের বিপ্লবী শিল্পকলা

মোনা সৌদি

পালেস্তাইনের বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এক সৃজনশীল পরিস্থিতি। পালেস্তাইন এবং আরব জনগণের মধ্যে এই পরিস্থিতি ক্রমশ বিকশিত হয়েছে এবং ললিতকলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

বিপ্লব যেহেতু অকর্মণ্যতা এবং স্থবিরতার প্রতিধর্মী, সেইজন্য এই সময়ে সাহিত্য এবং ললিতকলার দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করা গেছে। বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি এবং শিল্পীরা পালেস্তাইন জনগনের এই পরিবর্ত্তিত নতুন অবস্থাকে বিষয় হিসাবে বেছে নিতে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত হয়েছেন। ললিতকলার এই বিকাশ বিপ্লবের বানীকে স্বদেশে এবং বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। বহু পালেস্তেনীয় শিল্পী এইভাবে সারা পৃথিবীতে তাঁদের অবদান রেখেছেন এবং স্বীকৃত হয়েছেন।

বিপ্লব প্রসারের সাথে সাথে ললিতকলাও বিকশিত হয়েছে সমভাবে। বিপ্লবী শিল্পকলা হচ্ছে পালেস্তাইন, আরব এবং সারা পৃথিবীর শিল্পীদের মেধা এবং পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। পালেস্তাইন জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে জীবন গড়ার কাজে এই শিল্পকলা সৃষ্টি করেছে এক অবাধ সুযোগ। তিরিশ বছর পুর্বে পালেস্তাইনের শিল্পকলা কৃত্তিম কারুকলা, নানারূপে ধর্মীয় প্রতিচ্ছবি এবং প্রতীক অঙ্কনের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েলী সম্প্রসারনবাদীদের পালেস্তাইন ভূমির উপর দখলকারী সত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর পালেস্তেনীয় জনগণ তাদের মাতৃভূমি থেকে হয় বিতাড়িত হলো নতুবা অধিকৃত এলাকায় অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে বাধ্য হলো। পালেস্তেনীয় শিল্পীদের একজন পথিকৃত ইসমাইল সাম্মাৎ এই বিয়োগান্ত বাস্তুত্যাগের ঘটনার বিষয়ে ছবি এঁকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সাধারণত দেখা যায় অধিকাংশ শিল্পীরাই তাদের শিল্পীজীবন সুরু করেন নানা ভাবে প্রকৃতির ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে, কিন্তু পালেস্তেনীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তাঁরা শিল্পীজীবন শুরু করেছেন তাদের জীবনের অন্তর্বেদনাকে ছবিতে মূর্ত্ত করে তোলার মধ্য দিয়ে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পালেস্তাইনের চারুকলা প্রধানত তওফিক আবদুল-অল এবং ইব্রাহিম হাজিম্মের মত বাস্তবধর্মী শিল্পকলার অনুসারী ছিল। পৌরাণিক কান্নাইট এবং মিশরের

শিল্পকলার নানারূপ প্রতীক এবং উপকথাকে ভিত্তি করে মুস্তাফা অল-হাল্যাজ এক অনন্যসাধারণ অঙ্কনধারা গড়ে তোলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকায় বসবাসকারী কামাল বালাটা যিনি তার শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ইতালীতে, চাইনিজ কালিতে আরবীয় আক্ষরিক চিত্রলিপি পদ্ধতিতে অঙ্কন-রীতি গড়ে তুলে তাঁর ছবিতে পালেস্তাইন জনগণের স্বাধীনতার আকুতিকে ফুটিয়ে তোলেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি শুধুমাত্র আক্ষরিক চিত্রলিপিকেই তার অঙ্কনরীতির মাধ্যম করে এবং প্লাস্টিক রং ব্যবহার করে নানারূপ বিমূর্ত্ত জ্যামেতিক নক্সা অঙ্কন করেন। অঙ্কনরীতির বিভিন্নধারায় পালেস্তাইনের ঐতিহ্য এবং ধারাহিকতার পুর্ণউদঘাটন ঘটতে থাকে, যেমন জুমানা অল-হুসেনির 'সাহজিক শিল্পকলা'। ১৯৬৫ সালের পালেস্তেনীয় সশস্ত্র সংগ্রামের জন্মই পালেস্তাইনের ললিতকলার নবজন্ম ঘটায়, বিশেষভাবে সেটা প্রত্যক্ষ হয় ১৯৬৭-সালে, যুদ্ধপরবর্ত্তি সময়ে। পালেস্তেনীয় শিল্পীদের মধ্যে অনেকে যারা ইউরোপ আমেরিকা মিশর বাগদাদ-এ তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন যেমন কামাল বালাটা, মুস্তাফা অল-হালাজ, ভ্লাদিমির তামারি, আবদুল রহমান অল-মুজাইন এবং শাম্যা অল-হালাবি অঙ্কন রীতি ও প্রকরণে ক্রমশ পরিবর্ত্তন আনতে শুরু করলেন।

পালেস্তাইনের বিপ্লব শিল্পীদের সরাসরি বিরোধিতায় নামতে প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত হতে, সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করতে এবং এক নতুন চিন্তার বাতাবরন সৃষ্টি করতে অনুপ্রানীত করে যা সমস্ত পালেস্তেনীয় এবং সাথে সাথে অন্যান্য আরব শিল্পীদেরও অভিভূত করে, করে অনুপ্রাণিত। পালেস্তেনীয় শিল্পীদের অঙ্কনরীতির বিভিন্নধারা পালেস্তেনীয় আদর্শ ও বক্তব্যের পক্ষে সাযুয্য পুরোনো ঐতিহ্যবাহী বিষয় ও আঙ্গিকে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। পালেস্তাইনের শহরগুলির বিশেষ করে জেরুজালেমের ছবি জুমানা অল-হুসেনি অতি সাধারণ অঙ্কনরীতিতে হালকা রঙে অঙ্কিত করেন। ইব্রাহিম ঘন্যাম ফুটিয়ে তোলেন পালেস্তেনীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। আবদুল রহমান অল-মুজাইন-এর বিশেষত্ব কান্যাইট আমলের ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতি, তিনি পালেস্তাইনের পোষাকের বিশেষ ধরনের সূচীশিল্পের নক্সা পুনঃঅঙ্কনের উপরে তার মেধাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। অঙ্কনরীতিতে তিনি বর্তমান পালেস্তাইনের প্রতিরোধ আন্দোলনের বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক পালেস্তাইন এবং সেই সময়কার হস্তশিল্পকুশলীদের ব্যবহৃত নানারূপ যন্ত্রপাতি প্রামান্য-চিত্রের পদ্ধতিতে ব্যবহার করেন।

ইহুদী সম্প্রসারণবাদী শত্রুরা অদ্ভুতভাবে দাবী করে যে তারাই পালেস্তাইনের

Scanned with ACE Scanner

একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং পালেস্তেনীয়দের কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বা ঐতিহ্য কোনকালে ছিল না, একদিকে তাদের ঐ অদ্ভুত দাবীকে মোকাবিলা করা এবং অস্বীকার করা ও অন্যদিকে মাতৃভূমির ঐতিহ্য এবং অস্তিত্বকে রক্ষা করার কারনেই পালেস্তাইনের শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এবং রীতির আঙ্গিকে পুর্ণপ্রবর্তন করতে শুরু করেন।

পালেস্তাইনের শিল্পীরা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে পালেস্তাইন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার এবং সমকালীন অবস্থার মধ্যে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অধিকৃত এলাকার শিল্পীদের মধ্যেও মাতৃভূমি পালেস্তাইনের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ এক শক্তিশালী আত্মত্যাগী আন্দোলন বিরাজ করছে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন আবেদ আবেদী যিনি গ্রাফিক চিত্রকলা নিয়ে গণতান্ত্রিক জর্মন প্রজাতন্ত্রে চর্চা করেছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি 'ল্যাণ্ড ডে' (Land Day) শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি মিনারের নক্সা অঙ্কন করেন। তাঁর প্রকাশময় অননুকরণীয় তীক্ষ্ণ অঙ্কনশৈলী তিনি ঘন রেখাসমন্বিত অঙ্কনধারা এবং দৃঢ়বদ্ধ গঠনরীতিতে মূর্ত করে তোলেন। অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন পত্র এবং সাময়িক পত্রিকায় তাঁর অঙ্কিত ছবি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

পালেস্তাইনের নব্য যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় সুলেমান মনসুর অধিকৃত এলাকারজীবন সম্পর্কে প্রতীকী বাস্তবতার আশ্রয় নেন। যদিও তার কাজরেখায় ও রঙে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং চিন্তার ছাপযুক্ত, আর সেইসব পালেস্তেনীয়দের সংগ্রামের প্রতি কেন্দ্রীভূত, যারা বেআইনীভাবে দখলিকৃত দেশকে ধ্বংশস্তূপে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত ইহুদী যুদ্ধবাজদের সম্মুখীন হয়েও পবিত্র এবং উৎসর্গীত প্রাণ হয়ে দেশকে ভালবাসেন। দখলীকৃত এলাকায় সুলেমান মনসুর এবং তার অনুসারী শিল্পীদের শিল্পকর্মকে ইসরায়েলী দখলদারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এবং প্রতিবাদের অন্যতম শিল্পকর্ম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে অল বিরাহ প্রাঙ্গনের স্বাধীনতার প্রতিমূর্তির কথা। সহরের এই প্রতিমূর্তির প্রাঙ্গন পরবর্তীকালে দখলকারীদের বিরুদ্ধে জনজমায়েতের স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ইসরায়েলী জঙ্গীনায়কেরা এই ভাস্কর্যটিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে নেবার হুকুম দেয়, তারপর বুলডোজার দিয়ে সমূলে উৎপাটিত করে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়।

পালেস্তেনীয় প্রতিরোধের শিল্পকলা সবসময়ই পালেস্তাইন সশস্ত্র সংগ্রামকে করেছে উদ্দীপিত, জুগিয়েছে সাহস আর উৎসাহ। পালেস্তেনীয় সংগ্রামের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল চরিত্র যা একাধারে আরবীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগ্রামী-রূপকে মূর্ত করে এই শিল্পকলার মাধ্যমে তা' প্রকাশমান হয়। প্রথম থেকেই

Scanned with ACE Scanner

পালেস্তাইনের বিপ্লব শিল্পীদের প্রদান করেছে ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগে অনুশীলন করবার অবাধ স্বাধীনতা এবং এই অবাধ স্বাধীন মুক্ত আবহাওয়ায় বিকাশলাভ করেছে পালেস্তাইনের শিল্পকলা যা গণসত্তার বিকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পীদের নিজেদের স্বকীয় সত্তার বিকাশলাভকেও করেছে উন্মুক্ত।

আরও অনেক আরব শিল্পীও পালেস্তাইনের শিল্পকলাকে তাদের কাজের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে সিরীয় শিল্পী নাদার নাব্বার সেই প্রথম শিল্পীদলের মধ্যে একজন, যারা পালেস্তাইন বিপ্লবের উপর তখন সৃষ্টি করেছেন ছবি, এঁকেছেন পোস্টার যখন ফাতাহ্ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল নিমগ্ন।

ইরাকী শিল্পী অল-ঘড়াউই এঁকেছেন চমৎকার সব পোস্টার, চিত্রিত করেছেন ব্লাকসেপ্টেম্বরের সংগ্রামী যোদ্ধাদের স্মারক একখানা অসাধারণ বই আর সৃষ্টি করেছেন শহীদ এবং সংগ্রামী যোদ্ধাদের প্রতিকৃতি।

মোনা অল-সৌদি, এই প্রবন্ধের লেখিকা, জন্মসূত্রে জর্ডনীয় শিল্পী। ইনি ভাস্কর্য নিয়ে ফরাসীদেশে পড়াশোনা করেন ও কাজ শেখেন। বিপ্লবের জন্মলগ্ন থেকেই সংগ্রামের সাথে যুক্ত আছেন। তাঁর ভাস্কর্য প্রতীকধর্মী এবং তা' এযুগের ও দেশের ভাবধারাকে পরিস্ফুটিত করে। চাইনিজ কালিতে আঁকা তাঁর ছবি—পরিচ্ছন্ন শক্তিশালী রেখাঙ্কনের কাজ যা অক্ষরবিদদের কাজকে মনে করিয়ে দেয়। তাঁর অঙ্কনের বিষয়বস্তু মূলত মানুষ, বন্দুক আর বৃক্ষরাজি। বছর তিনেক আগে তিনি 'ভাস্কর্য-চারুকলা বিভাগ' (Plastic Art Section) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এই বিভাগ পালেস্তেনীয় প্রতিরোধের শিল্পকলার অনেকগুলী অন্তর্দেশীয় এবং বহির্দেশীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী করতে সমর্থ হয়।

পালেস্তেনীয় শিল্পীরা পালেস্তাইন জনগনের সাথে একই ধরণের কষ্টকর জটীল পরিস্থিতি এবং ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে চলেছেন। শিল্পীদের একাংশ বাস করছেন ইসরাইলী দখলদারী অঞ্চলের মধ্যে, অন্যরা ছড়িয়ে পড়েছেন সমস্ত আরব দেশের মধ্যে এবং কেউ কেউ জাপান, ল্যাতিন আমেরিকা এবং ইওরোপেও পড়েছেন ছড়িয়ে।

এই পরিস্থিতি স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প আন্দোলনকে ব্যাহত করছে। সুতরাং পালেস্তেনীয় শিল্পীরা স্বভাবতই সংগ্রাম করছেন, সংগ্রাম করছেন তাদের মাতৃভূমি পালেস্তাইনে ফিরে যাবার প্রয়োজনকে ব্যক্ত করতে।

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য

Scanned with ACE Scanner

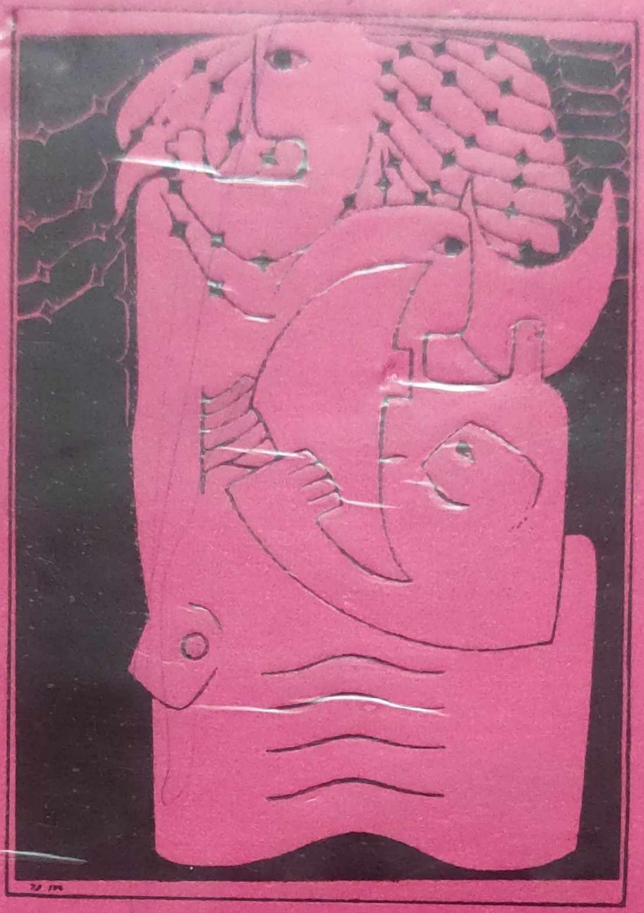

গত তিন দশক ধরে চলেছে পালেস্তাইনের মুক্তি সংগ্রাম
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ।

কান্না ঘাম রক্ত এবং মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে
স্বাধীন পালেস্তাইনের জন্য
সংগ্রামরত কবি শিল্পী গল্পকার প্রাবন্ধিকরা লিখে চলেছেন
অজস্র কবিতা গল্প প্রবন্ধ
গড়ছেন নতুন শিল্পকলা ভাস্কর্য।

সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয় শিল্প সাহিত্য।

এই সব গল্প কবিতা প্রবন্ধ এবং শিল্পকলা
থেকে কিছু নির্বাচিত করে
এই সংকলনের প্রয়াস।

পালেস্তাইন শিল্পকলা ও সাহিত্যের
একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে এই সংকলনটিতে।

Scanned with ACE Scanner